বেকার সমস্যা

কর্ম্মাণ্যারভমানং হি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে

শ্রীহৃষীকেশ সেন

১৩৩৪

রামেশ্বর এণ্ড কোং

চন্দননগর

[দাম দেড় টাকা

প্রকাশক
শ্রীরামেশ্বর দে
চন্দননগর।

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৩৪

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৭০১।২৭

বেকার সমস্যা

১

সমস্যাটা প্রায় সনাতন। সকল দেশেই এবং সকল কালেই কতকগুলি লোক আছে, যারা কাজ করে না। কেউ কাজ পায় না বলে' করে না, কেউ পেলেও করে না। এই দুয়ের মধ্যেই প্রধান কথা—যোগ্যতা; কখনো কাজটা লোকটার যোগ্য নয়, কখনো লোকটা কাজটার যোগ্য নয়। এই যোগ্যতা আবার অর্জ্জিত হয় বংশগত গুণ-দোষের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা, সামাজিক অবস্থার দ্বারা এবং অন্যান্য কারণের দ্বারা। এই সমস্তের সমবায়ে ইংলণ্ডে লোকের মধ্যে তিনটি শ্রেণী (class) হয়েছে—প্রথম শ্রেণীতে হচ্ছেন অভিজাত-বংশীয়েরা; মধ্য যুগে যাঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন সামন্ত-প্রধান (feudal chief). এঁদের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে যে এঁরা অনুপার্জ্জিত ধনের অধিকারী হয়ে প্রভুত্ব করেন। এঁরা সকলেই 'মহাত্মা প্রভু'—noble lords. দ্বিতীয় শ্রেণীতে হচ্ছেন তাঁরাই যাঁদের বংশের আভিজাত্য নেই, কিন্তু বিদ্যা আছে,

বুদ্ধি আছে ; এদেরই প্রবাদবাক্য "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে", এবং "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য", এঁরা বিদ্যাবুদ্ধির বলেই ধনের অধিকারী, ঐশ্বর্য্যের ভোক্তা ; সুতরাং এঁরা শারীরিক পরিশ্রমকে ঘৃণা করেন। শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা যাদেকে ধন উপার্জ্জন করতে হয়, কাজেই তাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী করতে হল—এই শ্রেণীই তৃতীয় শ্রেণী। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা আছে, বিদ্বেষ আছে এবং তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তা বলাই বাহুল্য। সমানাধিকারবাদীদের (Communists) ভাষায় এরই নাম class war. সমানাধিকারবাদীরা এখন এই শ্রেণীবিভাগ উঠিয়ে দিতে চান। শ্রেণীবিভাগজনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাও উঠিয়ে দিতে চান। সে অনেক কথা, এখন থাক। এই দ্বিতীয় শ্রেণী, প্রথম এবং তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী বলে' তাকে বলা হয় মধ্য-শ্রেণী, ইংরেজীতে middle class.

আমাদের দেশে এর অনুরূপ শ্রেণী নেই। কারণ, আমাদের সমাজের বিভাগ তিনটি নয়, অনেক ; আর তার মূলে আছে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ। এই বর্ণভেদ বা জাতিভেদ আবার উৎপন্ন হয়েছিল গুণকর্ম্মবিভাগ থেকে। এ সকল প্রত্নতত্ত্বের কথা বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য সাক্ষাৎভাবে অনাবশ্যক হলেও, সেকালের সামাজিক শ্রেণীবিভাগ বা বর্ণবিভাগ থেকে বর্ত্তমান অর্থনীতিমূলক সামাজিক অবস্থাভেদ কেমন করে' উৎপন্ন হয়েছে, তা বোঝবার জন্য এই পরিবর্ত্তনের ধারাটা জানতে পারলে তার পরিণাম সম্বন্ধেও আমরা একটা অনুমান করতে পারি। সেইজন্য অতীতের কথা, পুরাণো কথা বলে' পরিত্যাজ্য

নয়। ভারতের অতীত ইতিহাসও পুঁছে ফেলে নতুন করে' লেখা যাবে না।

বাঙলা দেশে এখন দুটি মাত্র 'জাত' আছে। "জঘন্যে যুগে, দ্বে জাতী"—রঘুনন্দন এই কথা বলে' গিয়েছেন। সেই দুটি জাত ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কোথায় গেল? রঘুনন্দন সে কথা কিছু বলেন নি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষি এবং শিল্প আগে বৈশ্যের কর্ম্ম ছিল, এখন শূদ্রের কর্ম্ম হয়েছে। গুণকর্ম্ম যা ছিল তাই আছে, কিন্তু বর্ণটা বদলে গিয়েছে, এবং সেই বর্ণের মধ্যে আবার ছত্রিশটা 'জাত' হয়েছে। এই জাতের প্রত্যেকের একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবসা ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। যেখানে ব্যবসা বদলে গিয়েছে সেখানে এখনও নামটা পুরাণোই আছে—যেমন গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, তেলী, তামলী, শাঁখারী, কাঁসারী, কুমোর, কামার ইত্যাদি। স্ব-ব্যবসায়ত্যাগী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও সেই কথা। তিনি এখন যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রভৃতি ছেড়ে দিয়ে চামড়ার সওদাগরের কেরাণীগিরি, অথবা স্বয়ং চামড়ার ব্যবসা করলেও "বর্ণানাং গুরুঃ" আছেন। বণিক বণিগ্‌বৃত্তি ত্যাগ করে' জমিদার হয়েছেন, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। এ সকল পরিবর্ত্তন ভাল কি মন্দ সে বিচার এখানে অনাবশ্যক। ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক, পরিবর্ত্তনটা ঘটেছে এবং তার জন্য সমাজের আর্থিক অবস্থাচক্রের একটা আবর্ত্তন (revolution) ঘটেছে, তা' আমাদের স্বীকার করতেই হবে। যা' হ'ক এই আবর্ত্তনের ফলটা বেকার সমস্যার সমাধানে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সৃষ্টির বিধানে মানুষের কৃত কোনো ব্যবস্থাই অচলায়তন হয়ে থাকতে পারে না। আগে হল ব্যবসা-অনুসারে 'জাত', তারপর হল 'জাত' অনুসারে ব্যবসা। তা'ও ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে লাগল। সে মন্থরগতির ক্রমটা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভে এই মন্থর গতিটা মহাপ্রবল ক্ষিপ্রগতি হয়ে উঠল। মন্থর গতির পরিণাম ক্রম-বিকাশজনিত পরিবর্ত্তন; প্রবল ক্ষিপ্রগতির পরিণাম হঠাৎ উদ্ভূত আবর্ত্তন। প্রথমটিকে ইংরেজীতে বলে ইভলিউশন (Evolution), দ্বিতীয়টিকে বলে রিভলিউশন (Revolution); দুটিই এক পদার্থ,—পরিবর্ত্তন; প্রভেদ কেবল গতির বেগে—Speed-এ। ইংলণ্ডে শ্রমশিল্প ব্যবসাটা ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকব্জার আবিষ্কার হল। ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাঙলা, থেকে বিলেতে অনেক টাকা গেল। মিঃ ডিগবি বলেন,—ইংলণ্ডের শ্রমশিল্প বিষয়ক প্রাধান্যের মূলে আছে বাঙলা এবং কর্ণাটের টাকা। * নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হল, শ্রমশিল্প ব্যবসাটা অতি অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ অতি-বিস্তৃতি লাভ করল। ইংরেজী সাহিত্যে এবং অর্থশাস্ত্রে তাকে বললে Industrial Revolution. সমানাধিকারবাদ (Communism), অন্যান্য অসংখ্য 'বাদ' বা 'ism'-এর মত কেবল আমেরিকা, জার্ম্মাণী বা ফ্রান্সেই নয়, ইংলণ্ডেও সাহিত্যে, সাময়িক পত্রে, সংবাদপত্রে, বক্তৃতামঞ্চে বেশ ধীরে ধীরে প্রচারিত হচ্ছিল; রুষিয়াতে সেটা হঠাৎ মুখের 'বাদ' থেকে হাতের 'কাজ' হয়ে

---

* Prosperous British India, pp. 30-31.

গেল; অমনি পৃথবীসুদ্ধ লোক বললে ওটা Revolution. যাক্, ও-কথা আমাদের উচ্চারণ করতে নেই। যা' বলতে চাচ্ছিলাম তা' এই যে, evolutionটা প্রবল বেগে হলেই তাকে বলে revolution.

এই রকম একটা প্রবল আবর্ত্তন যাকে ইংরেজীতে বলতে পারা যায় violent revolution, ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভে আমাদের সমাজে ঘটেছিল। রাজত্ব আরম্ভের পূর্ব্বেও এর সূচনা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসায় একচেটে অধিকার নিয়ে যখন এদেশে এসেছিলেন তখনকার এদেশীয় শিল্পকলার উৎকর্ষ সম্বন্ধে অধ্যাপক ওয়েবার বলেন,—ভারতীয় শিল্পীদের প্রস্তুত করা সূক্ষ্ম বস্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণ, ধাতুদ্রব্য ও জহরতের শিল্প, গন্ধদ্রব্য এবং অন্য নানা প্রকার কারুকার্য্য পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল............ একথা নিশ্চয় করে' বলা যায় যে, ভারতবর্ষে দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে তুলো থেকে সুতো তয়ের করা, এবং সেই সুতো থেকে কাপড়-বোনা খুবই উৎকর্ষ লাভ করেছিল—

"The skill of the Indians in the production of delicate woven fabrics, in the mixing of colours, the working of metals and precious stones, the preparation of essences and in all manners of technical arts, has from early times enjoyed a worldwide celebrity......Thus it may be safely concluded that in India the art of cotton-spinning and cotton-weaving were in a high state of proficiency two thousand years ago." *

* Imperial Gazetteer of India, Vol III, p. 195.

লৌহশিল্প সম্বন্ধেও ঐ কথা—ত্ব'হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের লোহা এবং ইস্পাত খুবই উৎকর্ষ লাভ করেছিল। স্থানীয় অভাব পূরণ করেও ভারতবর্ষ বিদেশে লোহার জিনিষ চালান দিত। অস্ত্রনির্ম্মাণের জন্য ইংলণ্ডও ভারতবর্ষ থেকে ইস্পাত নিত—

"The iron industry not only supplied all local wants. but it also enabled India to export its finished products to foreign countries. The quality of the material turned out had also a worldwide fame......The Indian steel found once considerable demand for cutlery even in England... This manufacture of steel and wrought iron had reached a high perfection at least two thousand years ago." *

নৌকা-নির্ম্মাণ-ব্যবসায়ও খুব উন্নত ছিল। অতি প্রাচীন কালের কথা আপাততঃ ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কথাই বলি।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী বলেছিলেন কলকাতার বন্দরে দশ হাজার টন মাল বইতে পারার মত নৌকা আছে। এর সবগুলিই ভারতে প্রস্তুত। এগুলি যে কেবল এদেশের নদীতেই চলে তা নয়, এরা বিলেতেও মাল নিয়ে যায়। বাঙলা দেশে নৌকা নির্ম্মাণ এত উৎকর্ষ লাভ করেছে যে এখন নিশ্চয় করে' বলা যায় যে বিলেতে মাল নিয়ে যাবার জন্য নৌকার আবশ্যক হলে, সমস্তই কলকাতার বন্দরে পাওয়া যেতে পারে। † কিন্তু ভারতীয় পণ্যদ্রব্য নিয়ে ভারত-নির্ম্মিত জাহাজ যখন সত্যসত্যই লণ্ডন বন্দরে পৌছল তখন

* Ranade's Essays on Indian Economics, pp. 159-60.

† Prosperous British India, p. 86.

সেখানকার জাহাজ-নির্ম্মাতাদের মধ্যে একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। টেমস্ নদীর উপর একটা শত্রুপক্ষীয় নৌ-বাহিনী হঠাৎ উপস্থিত হলেও বোধ হয় এত বড় চাঞ্চল্য দেখা যেত না। লণ্ডন বন্দরের জাহাজ নির্ম্মাতারা চীৎকার করতে লাগল তাদের ব্যবসার সর্ব্বনাশ হল, তাদের অন্ন গেল, তাদেকে সপরিবারে উপবাস করতে হবে। * কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টার্স একথা শুনলেন। বিলেত যাবার জাহাজে লস্কর নিযুক্ত করবার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা হল। এর মধ্যে একটি যুক্তি অতি চমৎকার। সেটি এই—ভারতীয় নাবিকেরা লণ্ডন বন্দরে পৌছে এমন সব দৃশ্য দেখে যে, তাতে ভারতবর্ষে থাকতে ইউরোপীয় চরিত্রের উপর তাদের যে শ্রদ্ধাভক্তি থাকে, তা একবারে লোপ পেয়ে যায়। আবার তারা ভারতে ফিরে এসে সেই সকল কথা সকলের কাছে প্রকাশ করে' বলে। ইউরোপীয় চরিত্রের উপর এসিয়াবাসীর একটা সসম্মান ভয়ভক্তি আছে। প্রাচ্য দেশে ইউরোপীয় প্রাধান্য রক্ষার জন্য সেটা অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু ভারতীয় নাবিকেরা বিলেত থেকে ফিরে এসে যে-সকল ঘৃণাজনক চরিত্রগত ব্যবহারের কথা প্রচার করে, তাতে সে সভয় ভক্তি রক্ষা করা অসম্ভব।—

"The native sailors of India are on their arrival here (London) led into scenes which soon divest them of the respect and awe they had entertained in India for European character.........The contemptuous reports which they disseminate on their return (to India) cannot fail to have a very unfavourable influence upon the minds of our Asiatic

* Taylor's History of India, p. 261.

subjects, whose reverence for our character, which has hitherto contributed to maintain our supremacy in the East, will be gradually changed......and the effects may prove extremely detrimental." *

ফলে, ইংলণ্ডগামী জাহাজে ভারতীয় লস্করের নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। রমেশ দত্ত তাঁর Economic History of British Indiaতে বলেন ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের এই ব্যবহারনীতি পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল চলেছিল; পার্লামেন্টের কমন্স সভায় প্রকাশ্যে এই নীতির সমর্থন করা হত, এবং এর ফলে ভারতবর্ষের অনেক শ্রমশিল্পজাত পণ্য ইংরেজ শিল্পীর উপকারার্থে ইংলণ্ড থেকে বহিষ্কৃত করে' দেওয়া হল। †

ভারতের শিল্পবাণিজ্যসমৃদ্ধি দেখেই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে এসেছিলেন। ভারতের বস্ত্রশিল্প, ঐতিহাসিক মারে (Murray) বলেন, এত সুন্দর ছিল যে, পৃথিবীর কোনো দেশের সুচারু কলাবিত্তা তা' উৎপন্ন করতে পারে নি। বিদেশী বণিকেরা নানা বিঘ্নবিপদ উত্তীর্ণ হয়ে এর জন্যে ভারতে আসতেন। ভিনিস এবং জেনোয়ার ব্যবসায়ীদের পরে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকেরা এই ব্যবসা হস্তগত করে' নেন। ইংরেজ বণিক তখন ভারতবর্ষের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সংগঠিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে অল্পমূল্যের সুন্দর কালিকো, মসলিন

* Appendix no. 47, Supplement to the Fourth Report, East India Company, pp 23-24.

† Report of the Indian Industrial Commission 1916-18, p. 250.

ও ছিটের কাপড় অনেক পরিমাণে বিলেতে যেত এবং সেখানকার লোক অতি আগ্রহের সহিত তা' কিনত। এই সকল জিনিষের বিক্রী এত বেড়েছিল যে, সেখানকার পশমী ও রেশমী বস্ত্রশিল্পীরা তাঁদের ব্যবসার হানির সম্ভাবনায় আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। ফলে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এবং ১৭২১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট আইন পাশ করলেন যে, পোষাক-পরিচ্ছদে বা গৃহসজ্জায় ছাপান বা রং করা কালিকো অথবা কাপাসসূতোর তৈরী কোনো কাপড় ইংলণ্ডে কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। *

সার হেনরি কটন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিখেছেন যে, একশ' বছর আগে এক ঢাকার বাণিজ্যের মূল্য ছিল এক কোটি টাকা। তখন ঢাকার লোকসংখ্যাও ছিল দু'লক্ষ। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিশ লক্ষ টাকার ঢাকাই মসলিন ইংলণ্ডে গিয়েছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে একটি পয়সারও না! যে সূতোকাটা আর কাপড়বোনা যুগ যুগ ধরে' কত হাজার হাজার লোককে অন্নসংস্থানের কর্ম্ম দিয়েছে, তা' আর এখন নেই। এই কর্ম্মে নিযুক্ত থেকে যারা এক সময় সঙ্গতিপন্ন ছিল, তারা এখন কোনো রকমে উদরান্ন সংস্থানের চেষ্টায় পল্লীগ্রামে গিয়েছে। ঢাকার লোকসংখ্যা এখন (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে) ৭৯,০০০ হাজার মাত্র। ঢাকারই যে কেবল এই অবনতি হয়েছে, তা নয়; সকল জেলারই এই দুরবস্থা। বৎসরের পর বৎসর কমিশনাররা এবং ডিষ্ট্রীক্ট অফিসাররা গবর্ণমেণ্টকে জানাচ্ছেন যে, দেশের সর্ব্বত্র শিল্পীশ্রেণীর দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কোম্পানীর আমলের প্রথমেই ইংরেজ-তাঁতিরা বাঙালী-তাঁতি-

* Lecky's History of England in the Eighteenth Century.

বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। কারণ, বিলেতের বাজারে তাদের রেশমী কাপড়ের আদর খুব বেড়ে গিয়েছিল। এই বিদ্বেষের ফলে, রমেশ দত্ত বলেন, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁদের নবপ্রাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে ভারতীয় রেশমশিল্পের আর উন্নতি না হয়ে যাতে অবনতি হয়, ক্রমে লোপপ্রাপ্তি হয়, তারই চেষ্টা করতে লাগলেন। কোম্পানী ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের পত্রে তাঁদের বাঙলার কর্ম্মচারীদের লেখেন যে, তাঁরা বাঙলা দেশে রেশমীসূতো-তৈরি কাজে উৎসাহ দিতে চান, কিন্তু রেশমীকাপড়-তৈরি কাজে নয়। অর্থাৎ কাঁচা মালটা বাঙলা দেশে তয়ের হ'ক, কিন্তু পাকা মালটা, কাপড়টা, তাঁদের দেশেই হবে। আর তাঁরা একথাও বলে' দিলেন যে, যারা রেশমীসূতো তয়ের করে, তাদেকে তাদের বাড়ীতে কাজ করতে দেওয়া হবে না। বাধ্য করে' কোম্পানীর কুঠিতে এনে কাজ করাতে হবে। *

বয়নশিল্পকে সমূলে বিধ্বস্ত করবার জন্য কোম্পানী বাহাদুর ভারতবর্ষে এই সকল বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করলেন। ওদিকে বিলেতেও ভারত-প্রস্তুত রেশমী ও সূতী কাপড় যাতে না যায় তার জন্য কোম্পানীর ডাইরেক্টারদের প্ররোচনায় ভারতীয় কালিকো ও সুতোর কাপড়ের উপর শুল্ক স্থাপন করা হল শতকরা ৮১ টাকা হিসাবে। কিন্তু বিলেত থেকে তয়ের হয়ে যে কাপড় এদেশে আসত তার উপর শুল্ক হল শতকরা ২॥০ টাকা মাত্র। "এর ফল যা

* Letter from the Court of Directors quoted in appendix 37 to the ninth Report of the House of Commons Select Committee on the Administration of Justice in India, 1783.

হ'ল তা বলাই বাহুল্য। মিঃ হেনরি সেণ্ট জর্জ্জ টাকার, যিনি ভারতবর্ষ থেকে বিলেতে ফিরে গিয়ে কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টার হয়েছিলেন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এ সম্বন্ধে বলেছিলেন—ভারতবর্ষের রেশমের কাপড় ও সুতো-রেশম মিশ্রিত কাপড় বিলেতের বাজার থেকে ত অনেক দিন হল বিদায় নিয়েছে। এখন ভারতবর্ষেই বিলিতি কাপড়ের আমদানী হচ্ছে। এইরূপে ভারতবর্ষ শিল্পের দেশ থেকে কৃষির দেশে পরিণত হয়েছে।—

"India is thus reduced from the state of a manufacturing to that of an agricultural country." *

এইরূপে বস্ত্রশিল্পই ছিল যাদের কর্ম্ম, তারা হয়ে গেল কর্ম্মহীন। তাদের সংখ্যা যে কত, কেউ কি নির্ণয় করেছে? বেকার সমস্যার সমাধানে একথা সবিশেষ মনোযোগের সহিত বিবেচনা করে' দেখতে হবে।

* Memorials of the Indian Government being a Selection from the papers of Henry St. George Tuckar, London, p. 494.

২

'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখনকার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ভারতবর্ষকে, বিশেষতঃ বাঙলাকে, নিঃশিল্প করে', শিল্পের উপাদান কাঁচা মাল উৎপাদন করতে নিযুক্ত করলেন। বন্দোবস্ত হল—বাঙলা কৃষিকর্ম্ম করে' রেশম, তুলো, পাট প্রভৃতি কাঁচা মাল ইংরেজকে যোগাবে, আর ইংরেজ সেই সকল জিনিষকে শিল্পপণ্যে পরিণত করবার কষ্ট স্বীকার করবেন স্বয়ং। বলা বাহুল্য তাঁদের প্রস্তুত শিল্প-পণ্য আবার এই দেশে এনে দেশবাসীর ঘরে ঘরে বিতরণ করবেন, একথাও সেই বন্দোবস্তের মধ্যে থাকল। এ বন্দোবস্তটা অবশ্য উহ্য, সুতরাং তাতে বাঙলার মতামত গ্রহণ করা তাঁরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করেছিলেন। বাঙলা তখন ইংরেজের পদানত, ইংরেজ প্রভু যা আদেশ করবেন, তাই শুনতে বাধ্য। এ অবস্থায় ইংরেজ কোম্পানী বাঙলার সম্মতি নেওয়া যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করবেন তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নেই।

এর কিছু পূর্ব্বেই কোম্পানী বাঙলা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী পেয়েছিলেন। সুতরাং কাঁচা মাল উৎপাদন করবার জন্য জমির উপর যে কর্ত্তৃত্বের আবশ্যক, তা'ও কোম্পানীর ছিল। প্রথম প্রথম নানা রকম অস্থায়ী বন্দোবস্ত পরীক্ষার পর জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

করে' কোম্পানী বাঙলা দেশে জমিদার নামক একটা নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি করলেন। কার্য্যতঃ এঁরা হলেন জমির খাজনা-আদায়ের ঠিকাদার। শিষ্টাচারের অনুরোধে এঁদেকে বলা হল জমিদার, ইংরেজীতে landlords. রেশমের ও কাপাস-সুতোর কাপড়বোনা কাজে, এবং সেই কাপড়ের কারবারে যে সকল লোক নিযুক্ত ছিল তারা যখন কোম্পানীর নতুন শাসন ব্যবস্থায় কর্ম্মচ্যুত হল, তখন তারা এই জমিদারদের কাছে জমি নিয়ে কৃষিকর্ম্ম করতে বাধ্য হল। অন্যান্য শিল্পীরাও কুলক্রমাগত শিল্পকর্ম্ম ত্যাগ করে', জমিদারের কাছে জমি নিয়ে কৃষিকর্ম্ম করতে বাধ্য হল। কোম্পানী জমিদারকে দিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর প্রজাকে দিলেন সেই সদ্যঃসৃষ্ট জমিদারের অস্থায়ী অনুগ্রহ—কোনো অধিকার নয়, কোনো বন্দোবস্ত নয়, সর্ব্ব প্রকার বন্দোবস্তের অভাব। জমিদার প্রজার এই অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে তার সুযোগটা হারালেন না। খাজনা স্থির করা এবং আদায় করা সম্বন্ধে যা-ইচ্ছা-তাই করতে লাগলেন। জমির ওপর প্রজার ভার বৃদ্ধি হল। শিল্প-বাণিজ্যে যারা সঙ্গতিপন্ন ছিল, কৃষিকর্ম্ম করে' তারা দীন-দরিদ্র হল। আর জমিদার হলেন হৃষ্টপুষ্ট পরাঙ্গপুষ্ট।

তারপরে এল ইংরেজী শিক্ষা। প্রজার শিক্ষা বিধান করা যে রাজধর্ম্ম, একথা ইংরেজ-রাজ প্রথমে স্বীকার করেন নি। যাতে দু'পয়সা লাভ হয় তাই ছিল কোম্পানীর প্রথম কাজ, অন্যান্য কাজ ছিল তারই আনুষঙ্গিক। শিক্ষায় প্রজার মঙ্গল হয়, প্রজার মঙ্গলেই রাজার মঙ্গল, এ উচ্চ উদার ভাব কোম্পানী হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। না পারবারই কথা; কারণ, তখনকার ব্রিটিশ

গবর্ণমেণ্টও জন সাধারণের শিক্ষার আবশ্যকতা বোঝেন নি। এখনকার গবর্ণমেণ্ট বলেন, প্রথমে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন ব্যবসাদার। তারপর ধীরে ধীরে ব্যবসাদারী শাসকগিরিতে পরিণত হয়। কিন্তু প্রজার শিক্ষাও যে শাসকের কর্ত্তব্যের মধ্যে, সে জ্ঞানটা জন্মায় নি। * হবেল (Howell) বলেন,—

"Education in India under the British Government was first ignored, then violently and successfully opposed, then conducted on a system now universally admitted to be erroneous, and finally placed on its present footing." †

কাজেই ইংরেজী শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত করেন গভর্ণমেণ্ট নয়, কয়েকজন দেশীয় ও বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং কয়েকজন মিশনারি সাহেব। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে উচ্চ জাতের ছেলেদের শিক্ষার জন্য 'কলিকাতা বিদ্যালয়' নামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে Baptist College স্থাপিত হয়। এখানে খৃষ্টান ধর্ম্মনীতির সঙ্গে সংস্কৃত ও আরবী পড়ান হত। তারপর হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়। এখানেও ইংরেজীর সঙ্গে প্রাচ্য ভাষা পড়ান হত। ক্রমে বিশপ কলেজ, জেনারেল এসেমব্লী ইনষ্টিটিউশন, লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি ইনষ্টিটিউশন স্থাপিত হল। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা যে কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা এবং খৃষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেই ক্ষান্ত থাকতেন তা নয়; তাঁরা হিন্দু জাতিকে এমন বর্ব্বর করে' সভ্য জগতে বর্ণনা করেছেন যে আজও দু-চার জন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ছাড়া সভ্য জগতের লোক হিন্দুদেকে

* Progress of Education in india by H. Sharp, C.I.E.
† Do. Do.

অতি বর্ব্বর জাতীয় মানুষ বলেই জানে। জেমস্ মিল এই মিশনারিদের কাছ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে' তাঁর ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস লিখেছেন। এই ইতিহাস হিন্দুদের বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার সবেরই এমন অকথ্য নিন্দায় পরিপূর্ণ যে তা আর ইতিহাস নামের যোগ্য নয়। সে ইতিহাস এখন বিস্মৃতির গুহায় লুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু মিশনারি-চিত্রিত হিন্দুদের এই চিত্র রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে যে ফল ফলিয়েছে, তা অতি ভয়ানক রকমের অনিষ্টজনক। ইংলণ্ডের জনসাধারণের এবং অন্যান্য দেশের জনসাধারণের অনেকেরই এখনও ধারণা আছে যে হিন্দুরা এখনও কোনো রকমের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার পাবার যোগ্য নয়। সভ্য জাতির অধীনতায় বাস করে' এখনও বহুকাল রাষ্ট্রনীতিতত্ত্ব শিক্ষা করাই তাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু সে কথা যাক। সে বিষয়ের আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

শিক্ষার কথা বলছিলাম। মিশনারিদের পরে গবর্ণমেণ্টও ইস্কুল-কলেজ স্থাপন করতে আরম্ভ করলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ঢাকায়, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বহরমপুরে কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা বিদ্যালয়' প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়। ইংরেজ সওদাগরের সঙ্গে ব্যবহারিক সম্বন্ধ রাখতে হলে ইংরেজী শিক্ষা অতি আবশ্যক। একথা দেশের লোকও বুঝেছিল, গবর্ণমেণ্টও বেশ বুঝেছিলেন। সুতরাং দেশের লোক এবং গবর্ণমেণ্ট সকলেই ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হলেন। প্রথম স্থাপিত ইংরেজী স্কুল-কলেজে শিক্ষিত হয়ে যাঁরা বার হলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই, ইংরেজ

সওদাগরদের এবং গবর্ণমেণ্টের অধীন নিম্নকর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হলেন। উচ্চকর্ম্মচারীরা অবশ্য বিলেত থেকে এলেন। এইরূপে ইংরেজী শিক্ষা প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ চাকরী পাবার উপায়স্বরূপ গণ্য হলেও পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভের উপায় বলেও স্বীকৃত হল। এই সময়েই রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে' ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য লর্ড আমহার্ষ্টকে লেখেন। এর ফলে যে আন্দোলনের আরম্ভ হয় তার শেষ হয় মেকলের মিনিটে (Minute) এবং লর্ড বেণ্টিঙ্কের ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মন্তব্যে (Resolution). তারপর থেকেই গবর্ণমেণ্ট পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করলেন। কিন্তু কেউ কেউ (এবং তার মধ্য থেকে ভারতগবর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী মিঃ শার্প—H. Sharp—একজন) মনে করেন যে, মেকলের উদ্দেশ্য ছিল অল্প সংখ্যক লোকের জন্য ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা, আর অধিক সংখ্যকের জন্য দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা—

"He (Macaulay) appears to have advocated English for the few and the consequent improvement of the vernaculars (and enrichment of their literatures) for the many."

কিন্তু ইংরেজী বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সংখ্যা তাঁর উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করেছে, অথচ দেশীয় ভাষার উন্নতি সে পরিমাণে হয় নি। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যে ডেস্পাচ লেখা হয়, তার সমালোচনা করে' রাজা রাধাকান্ত দেব লিখেছিলেন যে, ইংরেজী শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন করতে হলে অতি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, তা না হলে, ফল হবে বিষময়। এক ইংরেজী শিখে'টু

তাঁতির ছেলে কাপড় বোনা ছেড়ে দেবে, কাঠুরের ছেলে কাঠ কাটা ছেড়ে দেবে, কৃষকের ছেলে লাঙ্গল ধরবে না। সকলেই গবর্ন্মেণ্ট অফিসে এবং সওদাগরী অফিসে কেরাণীগিরির জন্য অফিসগুলোকে ঘেরাও করবে। কিন্তু সকলের পক্ষে কেরাণীগিরি পাওয়া অবশ্য সম্ভব হবে না। তখন তারা হতাশ হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার অভিমানে আপন আপন ব্যবসায়ে আর নিযুক্ত হতে পারবে না, অসন্তুষ্ট হয়ে ভবঘুরে হবে,—

"Nothing should be guarded against more carefully than the insensible introduction of a system whereby with a smattering knowledge of English, youths are weaved from the plough, the axe and the loom to render them ambitious only for the clerkship for which hosts would besiege the Government and mercantile offices, and the majority being disappointed (as they must be) would (with their little knowledge inspiring pride) be unable to return to their trade, and would necessarily turn vagabonds." *

* Quoted at page 5 of Progress of Education in India.

৩

রাধাকান্ত দেবের অনুমান ঠিক হয়েছে। যে সকল শ্রমশিল্পী কোম্পানী-বাহাদুরের কৃপায় কুলক্রমাগত ব্যবসায় থেকে অপসারিত হয়ে ভারতের ভূ-ভার বৃদ্ধি করলে তাদের বংশধরেরা চাকুরীর লোভে ইংরেজী শিখে এখন চাকরী ত পাচ্ছেই না, উপরন্তু পিতৃ-পিতামহের ব্যবসায় করতেও লজ্জিত হচ্ছে। রাধাকান্ত দেবের এ কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল না যে, কৃষকের বা শ্রমজীবীর পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা দূষণীয়। কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের পক্ষে কোনো ভাষা বা কোনো বিষয় শিক্ষা নিষিদ্ধ হতে পারে না, এ কথা এখনকার লোকেও যেমন বোঝে রাধাকান্ত দেবও তেমনি বুঝতেন। কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, ইংরেজী শিক্ষাটা যে-প্রণালীতে প্রবর্ত্তিত হল, তাতে একটা বৃথা আভিজাত্য জন্মাল, যার পরিণাম হল এই যে, ইংরেজী শিক্ষিত লোক হাতের পরিশ্রমের কাজকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে লাগল। এটা যে কেবল কৃষকের আর শ্রমজীবীর সন্তানেরাই করলে তা' নয়; জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকেই করতে লাগল। এখন আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বুঝতে পারছি যে এই শিক্ষার বৃথা আভিজাত্য আমাদেকে শ্রমিক জনসাধারণের কাছ থেকে পৃথক্ করে' রেখেছে। তার ওপর, যাঁরা এই শিক্ষা লাভ করে' ইংরেজের

চাকরী পেয়ে কৃতার্থ হলেন, তাঁরা ইংরেজ প্রভুর সামীপ্য লাভ করে', ইংরেজ যেমন এদেশীয়ের প্রতি ব্যবহার করেন, সেইরূপ ব্যবহারই করতে লাগলেন। তাঁরা মনের অজ্ঞাতসারে বিশ্বাস করতে লাগলেন যে তাঁরাও শাসনকর্ত্তৃদলের লোক, বিজাতীয় শাসনকর্ত্তৃ-ধর্ম্মই তাঁদের ধর্ম্ম। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় অনেকেই চাকরী পেলেন না। চাকরী না পাবার প্রধান কারণ, গবর্ণমেণ্ট অফিসে এবং সওদাগরী অফিসে যত চাকরের আবশ্যক, স্কুল-কলেজ থেকে বেরুল তার চেয়ে অনেক বেশী। চাহিদার চেয়ে যোগান হল বেশী। শিক্ষিতদের বাজারদরও ক্রমে কমে' যেতে লাগল। এ সম্বন্ধে Indian Industrial Commission বলেন,—

"The System of education introduced by Government was, at the outset, mainly intended to provide for the administrative needs of the country and encouraged literary and philosophic studies to the neglect of those of a more practical character. In the result, it created a disproportionate number of persons possessing a purely literary education, at a time when there was hardly any form of practical education in existence. Naturally the market value of the services of persons so educated began eventually to diminish." *

এই রকম করে' আমরা দেখতে পাই, শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস, প্রজাস্বত্ব-বিলোপী নতুন জমিদারী বন্দোবস্ত এবং ভৃত্যপ্রসবিনী ইংরেজী শিক্ষা—এই ত্র্যহস্পর্শযোগে বাঙলায় ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হল। তারপরেই দেখতে পাওয়া যায়, এ দেশের কাঁচা

* Report of the Indian Industrial Commission, p. 90.

মাল রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে বিলেতে এবং বিলেতের শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী হয়ে আসছে এদেশে। ১৮৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে ৮,৭১,১২,৫০০৲ (আট কোটি একাত্তর লক্ষ বার হাজার পাঁচ শ') টাকার মাল ভারতবর্ষ থেকে বিলেতে রপ্তানি হয়েছিল। তার মধ্যে কাঁচা মাল ছিল শতকরা ৯৩৷৷০ (সাড়ে তিরানব্বই) টাকার এবং শিল্প দ্রব্য ছিল মোট ৬৷৷০ (সাড়ে ছ') টাকার। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিলেত থেকে যে শিল্পজাত দ্রব্য এদেশে আমদানী হয়েছিল তার দাম ৭,৭০,৯৬,৩৪১৲ (সাত কোটি সত্তর লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিন শ' একচল্লিশ) টাকা। এই উভয় কারণের সংযোগে দেশের আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠল যে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হতে লাগল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পাঁচবার, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দু'বার, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ছ'বার, আর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আঠারবার দুর্ভিক্ষ হয়। সকলেই জানে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ মানে খাদ্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ অভাব নয়, খাদ্যদ্রব্য কেনবার জন্য লোকের অর্থের অভাব। ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের পর গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হল। তাঁরা বুঝলেন যে দুর্ভিক্ষ ত হবেই, তবে কিসে তার প্রকোপটা কমান যায় অথবা লোকগুলোর তার প্রকোপ সহ্য করবার ক্ষমতা বাড়ান যায়, তার একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে একটা কমিশন নিযুক্ত করা হল: কমিশনের প্রতি উপদেশ হল, তাঁরা তদন্ত করে' রিপোর্ট করবেন গবর্ণমেণ্ট এমন কি কাজ করতে পারেন যার দ্বারা দুর্ভিক্ষের কঠোরতা কমতে পারে, অথবা লোকগুলোর সহিষ্ণুতা বাড়তে পারে—

"How far it is possible for Government by its action to diminish the severity of famines, or to place the people in a better condition for enduring them." * *

এর মধ্যে বিশেষ করে' লক্ষ্য করবার কথা এই যে, গবর্ণমেণ্ট জানতে চেয়েছিলেন দুর্ভিক্ষের কঠোরতা কমান সম্ভব কিনা? যদি সম্ভব হয় ত তার জন্য গবর্ণমেণ্টকে কি করতে হবে? দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা তাঁদের অভিপ্রায় ছিল না, সম্ভবতঃ, সেটা অসম্ভব' বলে'। সেরূপ অভিপ্রায় থাকলে কমিশনের প্রতি উপদেশও সেই রকম হত। যা' হ'ক, কমিশন নিযুক্ত হলেন এবং যথাসম্ভব অনুসন্ধান করে' রিপোর্ট দিলেন, বললেন দেশের লোকের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় কৃষি; বৃষ্টি না হলে কৃষি চলে না; কৃষি না চললে লোকের যে কেবল খাদ্যের অভাব হয় তাই নয়; তাদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য যে প্রধান কর্ম্ম তারও অভাব হয়। কারণ, কৃষিকর্ম্ম ভিন্ন দেশে অন্য কোনো কর্ম্ম নেই সুতরাং অর্থাগমের অন্য কোনো উপায়ই নেই। শিল্প-বাণিজ্য লুপ্তপ্রায়। এখন একমাত্র উপায় কৃষিকর্ম্ম ছাড়া অন্যান্য শ্রমশিল্পের প্রবর্ত্তন। কমিশন বললেন,—

"We have elsewhere expressed our opinion that at the root of much of the poverty of the people of India, and of the risks to which they are exposed in seasons of scarcity, lies the unfortunate circumstance that agriculture forms almost the sole occupation, of the mass of the population, and that no remedy for the present evils can be complete which does not include the introduction

* **Report of the Indian Industrial Commission, p. 258.**

of a diversity of occupations through which the surplus population may be drawn from agricultural pursuits and led to find the means of subsistence in manufactures or some such employments." *

এর মধ্যে দুটি কথা আমাদের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ হয়; দ্বিতীয়, অতিরিক্ত লোকগুলিকে কৃষি-কর্ম্ম থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোনো শ্রমশিল্পে নিযুক্ত করা। বৃষ্টির অভাব যে ভারতবর্ষের একচেটে সম্পত্তি, এমন বিবেচনা করবার কোনো হেতু নেই। অনাবৃষ্টি পৃথিবীর অন্য দেশেও হয়, কিন্তু তার জন্য দুর্ভিক্ষ হয় কেবল ভারতবর্ষে। অন্য দেশে অনাবৃষ্টির জন্য কৃষি-কর্ম্মের আবশ্যক জলের অভাব পূরণ করতে খাল আছে; আর এ দেশে তার পরিবর্ত্তে আছে, অনাবৃষ্টি সত্বেও কৃষিকর্ম্মে যদি কিছু জন্মায়, তা' দেশান্তরে চালান দেবার জন্য রেল। দ্বিতীয়টি, কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত অতিরিক্ত (surplus) লোকগুলি। বলা বাহুল্য, এই অতিরিক্ত লোকগুলি হচ্ছে তারাই যারা আগে বয়ন-শিল্প, নৌকা-নির্ম্মাণ ও লৌহ-যন্ত্রাদি-নির্ম্মাণ প্রভৃতি শ্রমশিল্পে নিযুক্ত ছিল এবং যাদেকে বলপূর্ব্বক ইংরেজ কোম্পানী কর্ম্মচ্যুত করেছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙলার কৃষকের জমির পরিমাণ প্রত্যেকের গড়ে ৬॥০ সাড়ে ছ' বিঘা মাত্র। আর এই জমিটুকু ছাড়া তার জীবিকানির্ব্বাহের অন্য উপায় নেই। এই অতিরিক্ত লোকগুলিকে যদি আগেকার মত শ্রম-শিল্পে নিযুক্ত করা যায় তা'হলে জমির উপর এখন যে ভার পড়েছে তার অনেক লাঘব হয়।

তারপর ইংরেজ কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হল, তুলাদণ্ড

* Report of the Indian Industrial Commission, p. 258.

ব্যবহারে অভ্যস্ত বণিকের দল যে রাজদণ্ড-পরিচালনের অযোগ্য তা প্রমাণিত হয়ে গেল। ব্রিটিশ রাজমুকুট ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন। প্রজার শাসনভার নিলেন বটে কিন্তু প্রজার পালন-কার্য্যের মূলে বনিগ্‌বৃত্তিটা থেকেই গেল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে শিল্পবাণিজ্য প্রধান ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান করে' ব্রিটিশ শ্রমজীবী ও ব্রিটিশ বণিক্ পালনের জন্য ভারতীয় শিল্পী ও বণিককে কেবল কাঁচা মাল উৎপাদন করা ও রপ্তানি করার বিধিব্যবস্থা করেছিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় নীতি (laissez faire) অবলম্বন করলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বা তাঁদের নিয়োগপ্রাপ্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় কৃষিশিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য কিছুই করলেন না। কিন্তু সে নিষ্ক্রিয় নীতি চলল না। তাতে দেশটা নিঃস্ব হয়ে গেল। তারপর যখন ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হতে লাগল এবং তাতে লোকক্ষয় ও রাজস্ব-হানি হতে লাগল, তখন, আগেই বলেছি, এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য অনুসন্ধান আরম্ভ হল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কমিশন তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন এবং তাতে গবর্ণমেণ্টকে দেশীয় কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। তারপর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সে কমিশন বলেছিলেন দুর্ভিক্ষের উপসর্গগুলির প্রশমনের জন্য অনেক প্রকার মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা হয়েছে বটে, কিন্তু তার নিবারণকল্পে বিশেষ কিছু করা হয়নি,—

"In regard to palliatives much has been done; but in respect of prevention, the hand has been slackened." *

* Report of the Indian Industrial Commission, p. 258.

এর মধ্যে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি এ বিষয়ের আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এই মহাসমিতি মন্তব্য প্রকাশ করেন যে দেশের দারিদ্র্য দূর করবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হ'ক, যেন তাঁরা দেশের অবস্থার উপযোগী শিল্পকলাশিক্ষার বিস্তার করেন, দেশে যা কিছু শিল্প আছে তার পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য যথোচিত উৎসাহ দেন এবং সেই উদ্দেশ্যে দেশীয় লোকের যে শিল্পবুদ্ধি ও শিল্প-কুশলতা আছে তা' কাজে নিযুক্ত করেন। পর বৎসর, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সমিতি প্রার্থনা করেন যে শিল্পকলাশিক্ষার প্রবর্ত্তন উদ্দেশ্যে দেশের শিল্পকলার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান হ'ক। ১৮৯১, '৯২, '৯৩, '৯৪ ও '৯৫ খৃষ্টাব্দে এই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষ্য করে' জাতীয় মহাসমিতি আবার বলেন যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের অন্যতম উপায় হচ্ছে দেশীয় লুপ্ত শিল্প-কলার পুনরুদ্ধার। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যেন সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করেন এবং তার জন্য অর্থব্যয়ে কার্পণ্য না করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহাসমিতি আবার প্রার্থনা করেন যে দেশে অন্ততঃ একটি পূর্ণাবয়ব বিবিধ শিল্পকলা শিক্ষালয় (Polytechnic Institute) স্থাপন করা

হ’ক, আর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তার অধীন শিল্প-ব্যবসায় শিক্ষালয় (Technical Schools and Colleges) স্থাপন করা হ’ক। ১৯০৫ এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেও ঐরূপ প্রার্থনা করা হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রার্থনায় আরও যোগ করা হয় যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং ক্রমশঃ বাধ্যতামূলক করে’ দেশব্যাপী করে’ দেওয়া হ’ক। ১৯০৮, ’০৯, ’১০, ’১১ এবং ’১৩ খৃষ্টাব্দে পুনঃ পুনঃ ঐ নিবেদন করা হয়। তারপর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। তাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আদেশে বিলেতের অনেক কল-কারখানাই কেবল যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করতে নিযুক্ত হল। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য অনেক শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা বন্ধ হয়ে গেল। জাহাজ সম্বন্ধেও তাই হল। বাণিজ্যের জাহাজগুলির অধিকাংশই যুদ্ধসম্ভার বহন করতে নিযুক্ত হল। সমুদ্রপথও বন্ধ হয়ে গেল। ফলে বিলিতি স্থচটি পর্য্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেল। আমরা ত এর অনেক আগে থেকেই “খেতে, শুতে, যেতে, প্রদীপটি জ্বালিতে” সকল জিনিষের জন্য বিলেতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে’ বসে’ থাকতে অভ্যস্ত হয়েছি। কাজেই আমাদের আর কষ্টের সীমা থাকল না। জাতীয় মহাসমিতি আবার গবর্ণমেণ্ট-সমীপে নিবেদন করলেন যে ভারতীয় শিল্পকলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নয়। কিন্তু এই সকল আবেদন অরণ্যে রোদন মাত্র হল। কিন্তু সে রোদনের শব্দ যে গবর্ণমেণ্টের কানে পৌঁছয়নি এমন কথা বলা যায় না। কারণ, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টই শ্রমশিল্পবিষয়ক একটা মন্ত্রণা সভা (Industrial Conference) করলেন। সদস্যেরা তাতে অনেক কথা বললেন। তার মধ্যে আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের

তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার জন হিবেট (Sir John Hewet) বললেন,—

"The question of technical and industrial education has been before the Government and the public for over twenty years. There is probably no subject on which more has been written or said, while less has been accomplished." *

অর্থাৎ কুড়ি বছরের বেশী হল এই ব্যবসায় শিক্ষা ও শ্রমশিল্প শিক্ষার সমস্যাটা গবর্ণমেণ্টের ও লোক সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত আছে। কিন্তু এত বেশী কথা ও কম কাজ বোধ হয় আর কোনো বিষয়ে হয়নি। কিন্তু জাতীয় মহাসমিতির আবেদন-নিবেদনই হ'ক আর দুর্ভিক্ষ কমিশনারের উপদেশই হ'ক, আর প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার মন্তব্যই হ'ক, ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছে সমান ফলদায়ক হল অর্থাৎ কোন ফলদায়কই হল না।

কিন্তু এ আন্দোলনের তরঙ্গ ইংলণ্ডে পৌছল এবং ব্রিটিশ জাতিকে এবং গবর্ণমেণ্টকে একটু উদ্বিগ্ন করে' তুলল। দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয় হলে রাজার অপযশ হয়। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। সভ্য জগতের রাজসমাজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যশ অক্ষুণ্ণ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। আর সেটা তেমন কঠিন কাজও নয়, কারণ, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্টই আছে। তার উর্ব্বর ভূমিতে এবং অনাবিষ্কৃত অখাত খনিতে ধনোৎপাদনের এত প্রচুর উপাদান আছে, যাকে কাজে লাগালে ভারতের আর্থিক উন্নতি হয়ে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হতে পারে, ইংলণ্ডেরও কিছু ধনাগম হতে পারে। এই

* Report of the Indian Industrial Commission, p. 263.

এক ঢিলে দুই পাখী মারবার কল্পনা ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্য জগতে এই সুযোগে আত্মপ্রকাশ করল এবং শীঘ্রই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে সংক্রামিত হল। ভারতের ধনস্থানে ইংরেজ মূলধনীদের একটু বক্রদৃষ্টি অনেক দিন থেকেই ছিল। ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের লোপ সাধন করে' তার স্থানে ভারতের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলিও কলে প্রস্তুত করতে ইংরেজ মূলধনী তাঁর ধন ইতিপূর্ব্বেই নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সে সকল জিনিষ ইংলণ্ডের কারখানায় প্রস্তুত হত। সেখানে মূলধনের প্রাচুর্য্য থাকলেও শ্রমজীবীর প্রাচুর্য্য ছিল না। তার উপর সেখানে কারখানা-সংক্রান্ত আইন-কানুনের প্রবর্ত্তন হয়ে শ্রমজীবীকে আর মূলধনীর ইচ্ছা অনুসারে খাটান যায় না। তা' ছাড়া, তাঁদের শিল্পজাত পণ্যের অনেক উপাদান এই দেশেই জন্মায়। সুতরাং অনেক মূলধনীর মনে হল এ দেশের উপাদান সে দেশে বয়ে নিয়ে গিয়ে শিল্পজাত পণ্যে পরিণত করে' আবার এদেশে নিয়ে এসে বিক্রী করার চেয়ে সেখান থেকে মূলধন এনে এদেশে কলকারখানা স্থাপন করে' ঐ সকল জিনিষ প্রস্তুত করলে শ্রমজীবী-সংক্রান্ত ও অন্যান্য অসুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। তা' ছাড়া, ভারতের ভূমিজ এবং খনিজ ধন এমন অনেক আছে যা এই দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব, যেমন নীল, চা, কয়লা, লোহা ইত্যাদি। এই সকলেরই নাম "material resources of India". সেজন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই material resources of India বা ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতি কিসে হয় তার অনুসন্ধান করতে রয়াল কমিশন নিযুক্ত করলেন। এই কমিশনের কাজ শেষ হবার পূর্ব্বেই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টও তথনকার

প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করবার জন্য একটা কমিশন নিযুক্ত করলেন, উদ্দেশ্য শিল্পকলা শিক্ষা দেবার জন্য প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর কিরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তা' স্থির করা। কারণ, দুর্ভিক্ষ কমিশন বলেছেন—দেশের লোককে কৃষিকর্ম্ম ছাড়া অন্য শ্রমশিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত করতে না পারলে দুর্ভিক্ষজনিত কষ্টের লাঘব অন্য কিছুতে হবে না।

ইংলণ্ডে যে রয়াল কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তার প্রতি এ ইঙ্গিতও ছিল যে ভারতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতি সাধন করতে হলে স্থানীয় শ্রমশিল্পীদের শিল্পকলা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। কারণ, ঐ সকল কর্ম্মের জন্য মূলধনের সঙ্গে উচ্চ কর্ম্মচারী বিলেত থেকে আমদানী হলেও, নিম্ন কর্ম্মচারী, শিল্পী ও শ্রমিক এইখান থেকেই তয়ের করে' নিতে হবে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রয়াল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হল। তাতে দেখা গেল ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতিসাধন করতে এবং স্থানীয় শ্রমশিল্পীদের সাহায্য করতে রয়াল কমিশন ভারত গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ করে' মনোযোগ দিতে অনুরোধ করেছেন। এর মধ্যে ভারতে রেলওয়ের বিস্তার হয়েছে, সুয়েজ খাল খোলা হয়েছে। তার ফলে বিলিতি শিল্পপণ্য নিয়ে বিলিতি জাহাজের এদেশে আসা খুব সহজ হয়ে গিয়েছে এবং রেলযোগে সেইসব শিল্পপণ্যের এদেশের নানা স্থানে বিতরিত হওয়াও খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। এইরূপে বিলিতি জিনিষ এদেশের সর্ব্বত্র সুলভ হয়ে যাওয়ায় ইংরেজ শিল্পীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ভারতীয় শিল্পীদের পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠল। রয়াল কমিশন মনে করেছিলেন এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয়

শিল্পীদের সাহায্য করাও ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। ভারত-গবর্ণমেণ্টও এর যুক্তিযুক্ততা এবং আবশ্যকতা মনে মনে বেশ অনুভব করেছিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁদের নিযুক্ত কমিশনকে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে বলেন নি। এই সকল কারণ-সমবায়ের ফলে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন ভারত গবর্ণমেণ্ট এক মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাতে গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন যে, এ পর্য্যন্ত যে শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত আছে, তাতে লোকের বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চ্চার অনুরাগই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু তাদের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য সে শিক্ষা যথেষ্ট নয়। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বিবিধ শিল্পকলাশিক্ষার অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের যে সকল শ্রমশিল্প কিছু অগ্রসর হয়েছে, যেমন বয়ন শিল্প, তাদেকেই উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে এবং তাতে নিযুক্ত যে শ্রমজীবী তাদেরই শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অন্যান্য শ্রমশিল্প এখনও অনেক পেছিয়ে আছে। তাতে নিযুক্ত শিল্পীদের শিক্ষার উন্নতি করলে এখন লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশী।

শিল্পকলা শিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ মন্তব্য হলেও সাধারণ শিক্ষাটা যাতে কার্য্যকরী হয় তারও কিছু চেষ্টা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত কলেজগুলিতে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা হল এবং এঞ্জিনিয়ারদের হাতে-হাতিয়ারে কাজ করবার শিক্ষারও ব্যবস্থা হল। বোম্বাইয়ে এর পূর্ব্বেই কতকগুলি কাপড়ের কল হয়েছিল। সেই সকল কলকারখানায় কাজ করবার যোগ্য করে' কতকগুলি শিল্পী প্রস্তুত করবার জন্য ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকনিকাল ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হল। শিল্পশিক্ষার জন্য কতকগুলি ভিন্ন

ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল। সেইগুলিকে একত্র করে' এই শিক্ষালয় স্থাপিত হল, অর্থ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ কিছু করতে হয় নি। অন্যান্য প্রদেশে এ বিষয়ে যা' কিছু অল্প-স্বল্প চেষ্টা হয়েছিল, তাতে কোনো ফল হয় নি।

বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভে গবর্ণমেণ্ট দেখলেন যে বিগত পনর বৎসরে শিক্ষা বিভাগ যা' কিছু করেছেন তা দেশের আবশ্যকের তুলনায় নিতান্তই অল্প এবং অসম্পূর্ণ। গবর্ণমেণ্ট এও বুঝলেন যে শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের উদ্যমশীলতা ও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য কর্ম্মের কোনো ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। সেইজন্য ১৯০১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন সিমলায় একটা পরামর্শ সভা (Educational Conference) আহ্বান করলেন। এই পরামর্শ সভার সদস্যেরা প্রচলিত উচ্চ শিক্ষার কঠোর সমালোচনা করলেন এবং পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রণালীটা যাতে আরও উন্নত হয় তাই করতে বললেন। তাঁরা শ্রমশিল্পশিক্ষা এবং অন্যান্য কলাশিক্ষা সম্বন্ধেও আলোচনা করলেন এবং যথারীতি রিপোর্টও করলেন এবং তাতে তাঁদের মতে, দেশের শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য যা করা উচিত তা'ও বলে' দিলেন। কিন্তু লর্ড কার্জ্জনের গবর্ণমেণ্টের দৃঢ় ধারণা ছিল যে দেশের শ্রমশিল্পবিষয়ক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশন এ সম্বন্ধে বলেন—

"The Simla Educational Conference also dealt with technical and industrial education ; but its recommendations were of little practical value owing to the dominating

idea that it was outside the province of Government to take any part in the industrial development of the country, beyond the provision of facilities for acquiring technical education and of information regarding commercial and industrial matters". *

এর মধ্যে দুটি কথা বিশেষ করে' মনে রাখতে হবে—প্রথম, দেশের শ্রমশিল্পবিষয়ক উন্নতি সাধন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের বহির্ভূত; দ্বিতীয়, দেশের শাসন কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের এই ধারণাটি সকল কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। এর টীকা অনাবশ্যক, কেবল এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, গবর্ণমেণ্ট যে দেশের দারিদ্র্য দুরবস্থা সম্বন্ধে এত কমিশন, কমিটি, কনফারেন্স নিযুক্ত করেছেন, তাঁদের রিপোর্ট পেয়েছেন, এবং তা' থেকে যথাসম্ভব এই দারিদ্র্য দুরবস্থার হেতু জানতে পেরেছেন অথচ তার প্রতিকারকল্পে বিশেষ কিছু করেন নি, তার মূলে আছে গবর্ণমেণ্টের ঐ প্রবল ধারণা যা' সকল কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু লর্ড কার্জ্জন বোধ হয় তাঁর সিমলা কনফারেন্সের পরামর্শে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কারণ তার অব্যবহিত পরেই তাঁর গবর্ণমেণ্ট শ্রমশিল্প বিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য আবার একটা কমিশন নিযুক্ত করলেন। কিন্তু সে কমিশনের রিপোর্ট আজও অপ্রকাশিতই আছে।

* Report of the Indian Industrial Commission, p. 94.

৫

এই অপ্রকাশিত রিপোর্ট-কমিটির পরামর্শ যাই হ'ক, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি ভারত গবর্ণমেণ্ট একটা মন্তব্য প্রকাশ করলেন। তাতে বলা হল যে, যারা সাধারণ শিক্ষায় একটু অগ্রসর হয়েছে, তাদের শ্রমশিল্প শিক্ষার জন্য শিক্ষালয় স্থাপন করা হবে; যে সকল স্থান শ্রমশিল্পের কেন্দ্র, সেই সকল স্থানেই এই সকল শিক্ষালয় স্থাপিত হবে; এবং অশিক্ষিত কারুকারদের শিল্পকলা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রাথমিক শ্রমশিল্প-শিক্ষালয় (Industrial Primary Schools) খোলা হবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের এই মন্তব্য যথারীতি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে জানান হল। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-গুলিও অনেক জল্পনা-কল্পনা পরামর্শ করলেন। মান্দ্রাজের উতকামন্দ নগরে একটা কনফারেন্স হল। তাঁরা বললেন গবর্ণমেণ্ট একটা স্বতন্ত্র শ্রমশিল্প বিভাগ করুন। শ্রমশিল্পশিক্ষা সেই বিভাগের অধীন থাকবে এবং শিক্ষাটা যাতে কার্য্যকরী হয় তার জন্য আদর্শ শ্রমশিল্প-ব্যবসায় খুলুন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই পরামর্শের শেষ অংশটা গ্রহণ করলেন না। তাদের মতে ওটা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়। শ্রমশিল্প সম্বন্ধে ইউরোপে যে সব নতুন নতুন উপায় আবিষ্কৃত হচ্ছে, নতুন কার্য্য-প্রণালী অবলম্বিত হচ্ছে, তাই এ দেশের লোককে

শিখিয়ে দেওয়াই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। সেটা হাতে-হাতিয়ারে কাজে করে' দেখানো—সেটা করবে অন্য লোকে। বোম্বাই, বাঙলা, আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, বর্ম্মা প্রভৃতি প্রায় সকল প্রদেশেই কমিটি করে' এই সকল বিষয়ের আলোচনা হল। এইরূপে লর্ড কার্জ্জন শিল্পকলাশিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে নীতি প্রবর্ত্তিত করে' গেলেন, আজও সেই নীতিই অনুসৃত হচ্ছে। শ্রমশিল্পশিক্ষার জন্য কলেজ খোলা হয়েছে, কোনো কোনো রেলওয়ে কারখানায় শিক্ষানবিশ নেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, আর ইউরোপ আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক কার্য্যপ্রণালী শিখে আস-বার জন্য বৃত্তি দিয়ে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত যুবককে ইউরোপ আমেরিকা পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ কারু-কারদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোনো বন্দোবস্ত হয়নি—কারুকার্য্য, শিল্পকলা বা সাধারণ শিক্ষা, কোনো শিক্ষারই বিশেষ কোনো বন্দো-বস্ত হয়নি। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশন এ সম্বন্ধে বলেন, যে সকল কারণে ভারতীয় শ্রমশিল্পের উন্নতি হয়নি, তার মধ্যে শ্রমজীবীদের অজ্ঞতা এবং সেই হেতু রক্ষণশীলতা, প্রধান। যাঁরা শ্রমিক নিযুক্ত করেন কমিশন তাঁদের অনেকেরই সাক্ষ্য নিয়েছেন। তাঁরা সকলেই বলেছেন অশিক্ষিত শ্রমিকের চেয়ে শিক্ষিত শ্রমিক সর্ব্বাংশে ভাল। তাদের বুদ্ধি আছে, আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান আছে। কারুকার্য্যে নিপুণ বা অনিপুণ, উচ্চ বা নীচ, সকলেরই ন্যূনকল্পে প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে আসা উচিত—একথা সকল সাক্ষীই বলেছেন। *

কিন্তু কমিশনযোগে গবর্ণমেণ্ট যা' জানতে পারেন, দেশের

* Report of the Indian Industrial Commission, p. 96.

লোকে তা' আগে থেকেই জানে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার জন্য একটা আইনের পাণ্ডুলিপি পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় (Imperial Legislative Councilএ) উপস্থিত করেছিলেন। উপস্থিত করবার সময় কেউ কোনো আপত্তি করেননি। কিন্তু এক বৎসর পরে যখন বিলটিকে সিলেক্ট কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠাবার প্রস্তাব হয়, তখন সরকার পক্ষ প্রস্তাবিত বিধির বিরুদ্ধে মহা আপত্তি উত্থাপন করলেন। তাঁরা বললেন—জনসাধারণ এরূপ শিক্ষার জন্য কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি; প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সকলেই এইরূপ বিধির বিরোধী; এবং বে-সরকারী মত, সংখ্যায় না হলেও গুরুত্বে, এর বিপক্ষে। এর জন্য অতিরিক্ত কর স্থাপনেও সকলেরই আপত্তি। সরকার পক্ষে আরও অনেক কথা বলা হয়, তার মধ্যে প্রধান কথা এই যে—জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং সিংহলের উপমা যে এদেশের সংবাদপত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে সর্ব্বদাই দেওয়া হয় সে উপমা এদেশে চলে না; বরোদা রাজ্যের নজীরও অচল। কারণ, সেটা এখনও পরীক্ষাধীন সুতরাং পাকা নয়। তা' ছাড়া, গোখলে অনুমান করেছিলেন এর জন্য সরকারের ব্যয় হবে সাড়ে চার কোটি টাকা, সরকার বলেন ব্যয় হবে তার দু'গুণ। শেষে সরকার পক্ষ বললেন পাণ্ডুলিপিটি অকালপ্রসূত এবং একে এখন আইনে পরিণত করলে প্রাথমিক শিক্ষার সবিশেষ ক্ষতি হবে। বিলটি ভোটে দেওয়া হল, সপক্ষে হল ১৩টি, আর বিপক্ষে অর্থাৎ সরকার পক্ষে হল ৩৮টি।

এদেশে ইংরেজ স্বচ্ছন্দে বললেন, দেশের লোকের শিক্ষার জন্য

তেমন আগ্রহ নেই, কাজেই জনসাধারণের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার প্রয়োজন নেই। কিন্তু লোকশিক্ষা সম্বন্ধে আজ ভারতবর্ষের যে অবস্থা ইংলণ্ডেরও একদিন সেই অবস্থা ছিল; আর সেটা বড় বেশী দিনের কথা নয়—উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ জে, স্কট রাসেল "Systematic Technical Education for the English People" নামে একখানি বই প্রকাশ করেন। তাতে প্রথমে জনসাধারণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে তিনি বলছেন ব্যবসায় শিক্ষার (technical education) যে কোনো মূল্য আছে, ইংরেজরা তা' বিশ্বাস করে না। আর সেই ব্যবসায় শিক্ষার যে একটা জাতীয় বিশিষ্ট প্রণালী থাকতে পারে, তা'ও বিশ্বাস করে না; আরও বিশ্বাস করে না যে লোকশিক্ষাটা গবর্ণমেণ্টের বা ব্যবস্থাপক সভার বা দেশের শিক্ষিত লোকের কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে যারা এই শিক্ষার অধিকারী হয়েছে, তাদেরই বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, আর যারা এই শিক্ষায় বঞ্চিত, তারা লক্ষ্মীর কৃপায়ও বঞ্চিত। তিনি আরও বলেন যে, ইংরেজ জাতির এই বিষয়ে অবহেলা যদি আরও কিছুদিন চলে তা হ'লে ইংরেজ সমাজ বিপদগ্রস্ত হবে। মিঃ স্কট রাসেলের নিজের ভাষাটা এই,—

"The English people do not believe in the value of technical education. Still less do they believe in the value of a national system of education and still less in the duty of Government, the legislature and the educated part of community to undertake the education of a whole people......technical education has brought good of a

national and commercial kind to those who possess it; that the want of it is attended with pecuniary loss, and that there is social danger to the community in our continued neglect of it." *

যে ইংরেজ নিজের দেশে ব্যবসায় শিক্ষার কোনো মূল্য আছে বলে' বিশ্বাস করতেন না এবং দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য সে শিক্ষার প্রবর্ত্তন যে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, তা'ও বিশ্বাস করতেন না, সেই ইংরেজের শাসকরূপে এই অধীন দেশে এসে যে—

"it was outside the province of Government to take any part in the industrial development of the country."

এই "dominating idea" স্বতঃই মনে হবে তাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

এ দেশের ইম্পীরিয়াল কৌন্সিলে গোখলের এই পরম হিতকর প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হতে পারল না। কিন্তু ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মিঃ স্কট রাসেলের কথাগুলি অতি সমীচীন বলে' বিবেচনা করলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মৌলিক শিক্ষা বিষয়ক আইন (Elementary Education Act) পাশ হল। সেই শিক্ষার জন্য বহু লক্ষ টাকার ব্যয় মঞ্জুর হল এবং শিক্ষাটাকে বাধ্যতামূলক করা হল। শ্রমশিল্প শিক্ষা ও ব্যবসায় শিক্ষাও (Industrial and Technical Education) এর অনুবর্ত্তন করলে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় শ্রমশিল্প এবং ব্যবসায় শিক্ষার জন্য স্থাপিত হল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এইরূপ শিক্ষালয়ের সংখ্যা ন'টি ছিল, এখন হয়েছে

* Systematic Technical Education for the English People, pp. 79-81.

আঠারটি। এই শিক্ষাই যে ইংলণ্ডের ব্যবসায়-বাণিজ্যিক উন্নতির মূল, তা' বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ড তথাপি এই শিক্ষার আরও বিস্তার চায়। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে বাণিজ্য-ব্যবসায় বিষয়িণী নীতি অবধারণ করবার জন্য একটা কমিটি (Committee on Commercial and Industrial Policy after the War) নিযুক্ত হয়। তাঁদের রিপোর্টে প্রকাশ প্রাথমিক শিক্ষা, তার পরবর্ত্তী শিক্ষা, শিক্ষানবিশী, ব্যবসায়িক শিক্ষা এবং কলা শিক্ষার প্রসার আরও বৃদ্ধি করতে হবে—

"Wide-spread and far-reaching changes in respect of primary and secondary education and apprenticeship and better technical and art education."

শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনো কথা বলা এখন অনাবশ্যক, তা' সাধারণ শিক্ষাই হ'ক আর শ্রমশিল্পবিষয়ক শিক্ষাই হ'ক। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অভাব ইংরেজ জাতির নেই। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর যা কিছু ত্রুটি আছে তা' ভারত-গবর্ণমেণ্টও বেশ বুঝেছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারির শিক্ষাবিভাগীয় মন্তব্যে তাঁরা বলেন—

"The defects of educational system in India are well known and need not be restated."

সুতরাং সেই সকল ত্রুটিসংশোধনের উপায় নির্দ্ধারণের কথাও গবর্ণমেণ্ট শুনতে প্রস্তুত নন্। তাঁরা বলেন আজও যে ত্রুটিগুলি সংশোধিত হয়নি, তার প্রধান হেতু অর্থাভাব। গবর্ণমেণ্ট পুনঃ পুনঃ বলে' আসছেন, তাঁদের সহানুভূতির অভাব নেই, অভাব কেবল অর্থের। অর্থাৎ ভারতের সুশাসনের জন্য, শান্তিরক্ষার জন্য, আইন ও সুশৃঙ্খলারক্ষার জন্য যে সকল রাজপুরুষ তাঁদের স্বদেশ থেকে স্বয়ং-নির্ব্বাসন বরণ করে' নিয়ে ভারতবাসীর ন্যাস-রক্ষকরূপে ভারতে শুভাগমন করেছেন, তাঁদের মনের শান্তি সুরক্ষিত করবার জন্য যে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আবশ্যক এবং তার

জন্য যে অবশ্য-প্রয়োজনীয় অর্থের আবশ্যক তার সংস্থান আগে করে', তারপর উদ্বৃত্ত অর্থ, যদি এবং যা' থাকে, তাই দিয়ে শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করাই বর্ত্তমান অবস্থায় বিজ্ঞতার কার্য্য। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ উদ্বৃত্ত কিছু থাকছে না।

কিন্তু দেশের লোক এ সকল গূঢ় কথা বোঝে না এবং ততোধিক অন্যায় করে না বুঝে' গবর্ণমেণ্টের কাজের সমালোচনা করে'। গবর্ণমেণ্ট উক্ত মন্তব্যে আরও বলেন্ যে-সকল উপমা সম্পূর্ণরূপে প্রযুজ্য নয় সেই সকল উপমার উপর নির্ভর করে' যে সমালোচনা করা হয়, তাতে গবর্ণমেণ্টের উপর অবিচারই হয়ে থাকে। যেমন, পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত আধুনিক প্রতীচ্য শিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে এখনও শৈশবাবস্থ অপূর্ণ বর্ত্তমান ভারতীয় শিক্ষা-প্রণালীর তুলনা। দেশের লোকের শতকরা তিরানব্বই জন নিরক্ষর; এই নিরক্ষরতা দূর করতে হবে; দেশের রাজস্বের উপর দেশের এই দাবী সব চেয়ে আগে মিটিয়ে দিতে হবে; এ সকল কথা, গবর্ণমেণ্ট বলেন, এখন সর্ব্ববাদিসম্মত, সে বিষয়ে আর বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক অনাবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যের ভাষায়—

"The proposition that illiteracy must be broken down and that primary education has, in the present circumstances of India, a predominant claim upon the public funds, represent accepted policy no longer open to discussion."

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এত কথার পরও যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এই নিরক্ষরতা দূর করবার প্রধান উপায়, তার

সম্বন্ধে ঐ মন্তব্যেই গবর্ণমেণ্ট বলেন যে সুশাসনের জন্য এবং অর্থাভাবের জন্য গবর্ণমেণ্ট বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে পারেন না,—

"For financial and administrative reasons of decisive weight the Government of India have refused to recognise the principle of compulsory education."

এর মধ্যে সবিশেষ অবধানযোগ্য কথা "administrative reasons of decisive weight". অর্থাৎ অর্থাভাব ত আছেই, তার উপর আছে শাসননীতির গুরুভার যুক্তি, আর এই যে, গুরুতর যুক্তিই শাসননীতি এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতির ব্যাপারে শাসন-নীতিকেই জয়যুক্ত করেছে। তবে, গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা, সদিচ্ছাই বলতে হবে যে, দেশের লোক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যথাসম্ভব প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করুক। অবৈতনিক শিক্ষা সম্বন্ধে আগেই বলেছি, গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, এদেশে এখনও তার সময় আসেনি। এইরূপ অনেক কথা বলে' গবর্ণমেণ্ট শেষে বলেছেন, এর চেয়ে আর বেশী কিছু করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এখন সম্ভব নয়,—

"Further than this it is not possible at present to go." *

* Progress of Education in India, published by the Govt. of India.

৭

এর পরে শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি; কিন্তু এই নীতি অনুসারে কর্ম্মকর্ত্তাদের সম্বন্ধে একটা খুব গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সংস্কৃত শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়ে শিক্ষা-বিভাগকে হস্তান্তরিত করে' দেশীয় মন্ত্রীর হাতে সমর্পণ করে' দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষাবিভাগের ভার নির্ব্বাচিত মন্ত্রীকে সমর্পণ করে' দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু এর চাবি-কাঠিটি অনির্ব্বাচিত গবর্ণমেণ্টনিযুক্ত রাজস্ব-মন্ত্রীর হাতেই আছে। ব্যবস্থা হয়েছে, মন্ত্রী মহাশয় শিক্ষাবিষয়ক সর্ব্ববিধ উন্নতি করতে পারেন, প্রাথমিক শিক্ষার বিপুল বিস্তার, শ্রমশিল্পশিক্ষার প্রবর্ত্তন, ব্যবসায়শিক্ষার অনুষ্ঠান, কৃষিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান, সবই করতে পারেন; তার একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং তার আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবও প্রস্তুত করতে পারেন; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, গবর্ণমেণ্টের ভাষায় "further than this it is not possible at present to go". কিন্তু দেশীয় মন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের মূলনীতি পরিবর্ত্তন করতে পারেন না, এবং মূলনীতির পরিবর্ত্তন না হলে কোনো মন্ত্রীই কিছু করতে পারেন না। আর মূলনীতির পরিবর্ত্তন করতে হলে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে

এখনো গবর্ণমেণ্টের জ্ঞান এই যে, প্রজার প্রাণ এবং ধন রক্ষা করলেই সমস্ত কর্ত্তব্যের শেষ হল। তার জন্য অবশ্য আইন ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা করাও কর্ত্তব্য। সেইজন্য সামরিক বিভাগ এবং পুলিস বিভাগকে হৃষ্টপুষ্ট করে' রাখা, গবর্ণমেণ্টের মতে, 'জনসাধারণের শিক্ষা এবং আর্থিক উন্নতিবিধানের চেয়ে বেশী আবশ্যক।

কিন্তু এবিষয়ে দেশের লোকের জ্ঞান গবর্ণমেণ্টের জ্ঞানের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। দেশের লোক মনে করে, প্রজার প্রাণরক্ষা ও ধনরক্ষা রাজধর্ম্মের চৌকীদারী অংশ মাত্র; তার চেয়ে বৃহত্তর এবং মহত্তর অংশ হচ্ছে প্রজার পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের উপায় বিধান করা, এবং তার জন্য প্রথমেই আবশ্যক জনগণের সাধারণ শিক্ষার এবং শ্রমশিল্প শিক্ষার দেশব্যাপী বিস্তার এবং তা' দ্বারা তাদের মনুষ্যত্ববিলোপী দারিদ্র্য নিবারণের উপায় বিধান করা। কর্ম্ম করবার শক্তি সামর্থ্য আছে এবং কর্ম্ম করতে ইচ্ছুক এমন লোককে কর্ম্ম দেওয়া এর একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ধারণা অন্যবিধ। তাই দেখতে পাওয়া যায় বাঙলার ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য

আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল	...	২৩,৪৬,০০০৲
বৎসরের শেষে হিসাব পরীক্ষা করে' দেখা গেল ব্যয় হয়েছে	...	২২,৫৪,০০০৲
অর্থাৎ একেই ত আনুমানিক ব্যয়টা ধরা হয়েছিল খুব কম করে', তার উপর, যা' ধরা হয়েছিল তা'ও খরচ না করে' বাঁচান হয়েছিল	...	৯২,০০০৲

এর সঙ্গে একবার পুলিসের ব্যয়ের তুলনা করে' দেখা যা'ক।

সি-আই-ডি বিভাগের ঐ বৎসরের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল—

ইন্‌স্পেক্টারদের বেতন	...	৯৫,০০০৲
কিন্তু খরচ করা হয়েছিল	...	১,০০,০০০৲
বেশী খরচ	..	৫,০০০৲
সব ইন্‌স্পেক্টারদের বেতন ধরা হয়েছিল	...	৩১,৪৪০৲
খরচ হয়েছিল	...	৩৪,০০০৲
বেশী খরচ	...	২,৫৬০৲
সহকারী সব ইন্‌স্পেক্টার এবং কেরাণীদের বেতন ধরা হয়েছিল	...	৪,৩৯২৲
খরচ হয়েছিল	...	৫,০০০৲
বেশী খরচ	...	৬০৮৲

এই দু' বিভাগের ব্যয়ের তুলনায় বেশ দেখা যাচ্ছে যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল তার চেয়ে খরচ করা হয়েছে কত কম। আর সি-আই-ডি'র জন্য যা মঞ্জুর করা হয়েছিল বাস্তবিক ব্যয়টা হয়েছে তার চেয়ে কত বেশী। এর কৈফিয়ৎ অবশ্য আছে, কিন্তু কৈফিয়ৎটা এমন স্বচ্ছ যে তার ভিতর দিয়ে কর্ম্মকর্ত্তাদের মনোভাব বেশ দেখতে পাওয়া যায়। দ্বৈতশাসনাধীন দেশীয় মন্ত্রীদের এই সামর্থ্যহীনতার সঙ্গে একবার আত্মশাসনবিশিষ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাবিষয়ক কার্য্য-

তৎপরতার তুলনা করা যা'ক। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। সেই সময় থেকে গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই পর্য্যন্ত প্রাথমিক স্কুল ও তার ছাত্র সংখ্যা হয়েছিল—

খৃষ্টাব্দ	স্কুলের সংখ্যা	ছাত্রের সংখ্যা
১৯২২-২৩	১২	...
'২৩-২৪	১৯	২,৩৬০
'২৪-২৫	৫১	৬,১২৮
'২৫-২৬	৮৯	১০,২০৮

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষে স্কুলের সংখ্যা ছিল ১০০টি। আর ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা বাবত কর্পোরেশনের ব্যয় হয়েছিল ৯১,৮১৩৲ টাকা। স্বায়ত্তশাসনের অধীন একটি নগরের এই হিসাব। এই স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ্য যখন সমস্ত দেশের জন্য দেশের লোক চায়, তখন গবর্ণমেণ্ট বলেন, দেশের লোক নিরক্ষর সুতরাং স্বরাজ্যলাভের অনুপযুক্ত; আবার যখন দেশের লোক সেই স্বরাজ্যলাভের বিঘ্নকারী নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার দেশব্যাপী বিস্তার চায়, তখন গবর্ণমেণ্ট বলেন, অর্থাভাব এবং ততোধিক গুরুতর শাসননৈতিক কারণে এখন তা হতে পারে না। যা হচ্ছে তার চেয়ে বেশী কিছু হওয়া এখন অসম্ভব।

৮

এখন একবার দেখা যা'ক গবর্ণমেণ্ট স্বপ্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতি অনুসারে কি করেছেন। গবর্ণমেণ্ট বলেছিলেন, উন্নত এবং আধুনিকতম প্রণালীতে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এবং তার জন্য বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অভ্ সায়েন্স নামক বিজ্ঞান-শিক্ষালয়টির উন্নতি করতে হবে। এই শিক্ষালয়টি বোম্বাইএর বিখ্যাত ধনী টাটার দানে প্রতিষ্ঠিত। সে যা' হ'ক, সেখানে যে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে দেশের শ্রমশিল্পের কি উপকার হচ্ছে তা' সাধারণ লোকে বড় একটা জানে না। বলা বাহুল্য যে, শিক্ষালয়টি জনসাধারণের জন্য নয় এবং শ্রমশিল্প-শিক্ষার জন্যও নয়। শ্রমশিল্পশিক্ষার জন্য একটি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কানপুরে। সেটির নাম টেক্‌নলজিকাল ইনষ্টিটিউট (Technological Institute). সেখানকার প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় শর্করা-রসায়ন অর্থাৎ চিনি প্রস্তুত করতে রসায়ন-শাস্ত্রের প্রয়োগ। আর আছে, পুষার কৃষি-বিজ্ঞানশালা। এই সকল শিক্ষালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়। তারপর আছে প্রাদেশিক কৃষি-কলেজগুলি। বাঙলায় এবং বিহার-উড়িষ্যায় কৃষি-কলেজ নেই! বিহারের সাবৌরে একটি

কৃষি-কলেজ ছিল, তাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুষায় কৃষি-বিজ্ঞানের যে সকল গবেষণা ও পরীক্ষা হয় তা' এ দেশের সাধারণ নিরক্ষর কৃষকের বোধগম্য নয়, সুতরাং তাদের কাজেও লাগে না। কিন্তু সে সকল তথ্য আমেরিকা ও জারমানিতে গিয়ে কাজে লাগে। এদেশে এই প্রতিষ্ঠানটির ফল হয়েছে এই যে, এখানকার পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগে চাকরি পায়। প্রাদেশিক কৃষি-কলেজগুলিও কৃষিবিভাগের চাকরির লোক জোগাচ্ছে। কোনো কোনো জেলায় এক একজন কৃষিকর্ম্মচারী কৃষকদের উপদেশ দেবার জন্য নিযুক্ত আছেন, কিন্তু তাদের দ্বারা কৃষির বিশেষ কোনো উন্নতি হচ্ছে বলে' ত কেউ জানে না। এদেশে উচ্চ কৃষিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হবার আগে বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষার জন্য এদেশের শিক্ষিত যুবককে বিলেতে পাঠান হত। এইরূপ কয়েকটি যুবক যখন বিলিতি-কৃষি-শিক্ষালাভ করে' দেশে ফিরে এলেন, তখন প্রথম প্রথম যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেকে কৃষিবিভাগের বড় চাকরি দেওয়া হয়েছিল। তারপর কৃষিবিভাগে যখন আর স্থান হল না, তখন তাঁদেকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি দেওয়া হল। কৃষিকর্ম্মকে আপনার ব্যবসায়স্বরূপে কেউই গ্রহণ করেননি। তারপর কৃষিশিক্ষার জন্য ভারতীয় যুবককে বিলেত পাঠান সম্পূর্ণ নিষ্ফল দেখে, সে প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হল। কৃষিশিক্ষার জন্য বিলেত পাঠান বন্ধ হল, কিন্তু অন্য অন্য শ্রমশিল্প-শিক্ষার জন্য ভারতীয় যুবককে বিলেত এবং ইউরোপের অন্য অন্য দেশে পাঠানর বন্দোবস্ত হল। গবর্ণমেণ্ট মনে করলেন এদেশে শ্রমশিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত করার চেয়ে সেইটাই সহজ। ১৯১২

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ পঁচাত্তরটি যুবককে বিদেশে পাঠান হয়েছিল। তার মধ্যে ছত্রিশটি ফিরে এসেছেন। এই ছত্রিশটির মধ্যে আঠারটি শ্রমশিল্পের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছেন, বাকী আঠারটির কথা জানা যায় না, অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করে' উঠতে পারেননি। সুতরাং বিলেতে কৃষিশিক্ষার মত শ্রমশিল্পশিক্ষাও বিফল হয়েছে বলা যেতে পারে। কারণ, এ সম্বন্ধে যা' প্রধান কথা তা' গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেননি। ব্যবসায়ের সফলতার যেটি গূঢ় এবং গোপনীয় তত্ত্ব সেটি ব্যবসায়ী শেখায় না, শেখালে তাদের ব্যবসায়ের হানি হয়। আমেরিকা, জারমানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সকল দেশের শিল্পীরাই এ বিষয়ে খুব সতর্ক। এই সতর্কতা জাপানী অভিজ্ঞতা থেকে আরও বেড়েছে। জাপানীরা আমেরিকা ও ইউরোপে গিয়ে শ্রমশিল্পের অনেক গুপ্ত রহস্য শিখে এসে নিজের দেশে সেই সকল শিল্পের আশাতীত উন্নতি করেছে এবং তার ফলে অনেক বিষয়ে আমেরিকা ও ইউরোপকে হারিয়ে দিয়েছে। আমেরিকা-ইউরোপের এই অভিজ্ঞতা লাভের পর এখন আর কোনো দেশের লোকেরই সেখানে শ্রমশিল্পব্যবসায়ের গূঢ় রহস্য জানবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং সেখানে গিয়ে যে সকল ভারতীয় যুবক শ্রমশিল্পব্যবসায় শিখে এসেছেন তাঁদের জ্ঞান নিতান্তই ভাসাভাসা, সে জ্ঞানের মূল্য অতি সামান্যই। তার উপর আর একটি কথা আছে। শ্রমশিল্প সম্বন্ধে এ দেশের যুবকদের যে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, ইউরোপীয় শিক্ষাই হ'ক আর দেশীয় শিক্ষাই হ'ক, তার বিষয়টা কি একবার বিশেষ করে' দেখা আবশ্যক। তৈলশিল্প (সকল

রকম তেলকে নির্ম্মল এবং নির্গন্ধ করা), রং প্রস্তুত করা, চিনি প্রস্তুত করা, চামড়া পরিষ্কার করা, তার মধ্যে প্রধান। এ সম্বন্ধে বিশেষ করে' দেখবার কথা এই যে, বিলেত থেকে যে সকল পণ্য এদেশে আসে, এগুলি তার মধ্যে নেই। এই সকল পণ্যের প্রস্তুত প্রণালী যদি ভারতবাসী শিখতে পারে এবং শিখে এই দেশে প্রস্তুত করতে পারে, তা হ'লে প্রতিযোগিতাটা হবে অন্য দেশের সঙ্গে, বিলেতের সঙ্গে নয়। তাতে বিলেতের কোনো স্বার্থ-হানি হবে না। এদেশ থেকে যত তৈলবীজ, যেমন কাপাস বীজ, চীনাবাদাম, রেড়ি, তিসি, তিল ইত্যাদি রপ্তানি হয়, তার অধিকাংশই যায় জারমানিতে এবং ফ্রান্সে। রং জারমানির একচেটে বললেও অত্যুক্তি হয় না। চামড়াও অধিকাংশ যায় জারমানিতে। আর এদেশে চিনির ব্যবসার উন্নতি করতে পারলে যদি কারও স্বার্থে আঘাত লাগে ত সে জাভার, ইংলণ্ডের তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। কাজেই শর্করা-শিল্প শেখাবার জন্য কানপুরে একটা টেকনিকেল ইনিষ্টিটিউট খোলা হয়েছে। এছাড়া, কয়েকটি বয়নবিদ্যালয় খোলা হয়েছে। বয়নবিদ্যালয়গুলির মধ্যে শ্রীরাম-পুরেরটিই প্রধান। সমস্ত বাঙলা দেশের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত বয়নবিদ্যালয় বোধহয় ঐ একটিই। সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমিতে ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল্প-শিক্ষানীতি এই কয়েকটি শিল্প-শিক্ষালয়ে প্রকটিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রাদেশিক এঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির কথা উল্লিখিত হল না, কারণ, ঐ কলেজগুলি গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারী প্রস্তুত করবার জন্যই স্থাপিত হয়েছিল এবং সেই কার্য্যেই নিযুক্ত আছে।

আমাঁদের রাজপুরুষেরা বলে' দিয়েছেন যে আমেরিকা, ইউরোপ বা জাপানের সহিত শিক্ষা বিষয়ে ভারতবর্ষের তুলনা করা অন্যায়। রাজপুরুষদের দৃষ্টিতে সেটা অন্যায় হলেও দেশের লোক ঐ সকল দেশের শিক্ষাপ্রণালীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারে। সেইজন্য এখানে জারমানি এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থার, প্রধানতঃ শ্রমশিল্প এবং ব্যবসায় শিক্ষার কথা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জারমানিতে পৌরোহিত্য, চিকিৎসা, আইন, রাষ্ট্রনীতি, সৈনিকবৃত্তি, রঙ্গালয়ে অভিনয়, বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা প্রভৃতি যেমন ব্যবসায় বলে' গণ্য, তেমনি পরিচারক—পরিচারিকা-বৃত্তি এবং দিন-মজুরিও ব্যবসায় বলে' গণ্য। ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষতা, রাসায়নিক কর্ম্মশালার পরিচালনা, ইলেকৃট্রিক কল-কারখানার প্রধান এঞ্জিনিয়ারিং—এ সমস্তই ব্যবসায়। সেইজন্য জারমানিতে সকল প্রকার ব্যবসায় ও বৃত্তি শেখাবার জন্য শিক্ষালয় আছে। এই শিক্ষালয়গুলিকে প্রধানতঃ সাত শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম, কাউফম্যানিষ বেরুফস্ স্কুল (Kaufmannische Berufsschule). এখানে যে সকল বালক বা যুবক কোনো বাণিজ্যব্যবসায়ে শিক্ষানবিশরূপে নিযুক্ত আছে তাদেরই শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জারমানিতে এইরূপ বিদ্যালয় ছিল একটি মাত্র। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে হয়েছিল ৮৫০টি। প্রুশিয়াতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এইরূপ শিক্ষালয়ে বালক-বালিকার সংখ্যা ছিল ১২টি। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে হয়েছিল ৯৪,১২৮—তার মধ্যে বালিকার সংখ্যা ৪২,২৭৯। ঐ বৎসর সমস্ত জারমানিতে এইরূপ বালক-বালিকার সংখ্যা ছিল ১,৪০,০০০ (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার)।

আগেই বলেছি এই সকল বালক-বালিকারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে শিক্ষানবিশি করে। সুতরাং এই শিক্ষালয়ে তারা আসে দিন এক ঘণ্টার জন্যে। শিক্ষার কাল তিন বৎসর এবং বিষয়—বাণিজ্যনীতি, ব্যবসায়িক পত্রব্যবহার, জারমান ভাষায় রচনা, হিসাব রাখা, বাণিজ্যিক ভূগোল এবং নাগরিকের কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়, শ্রমশিল্প শিক্ষালয়। ১৮ বৎসরের অনধিকবয়স্ক যে সকল বালক-বালিকা কলকারখানায় কাজ করে' জীবিকনির্ব্বাহ করে, তারাই এখানে শিক্ষিত হয়। এখানকার শিক্ষার প্রধান বিষয় শিল্প-যন্ত্রাদির ব্যবহার, শিল্পের উপাদান কাঁচা মালের গুণ-দোষ পরীক্ষা এবং শিল্পপণ্যের প্রস্তুত প্রণালী। তারপর সেই পণ্যের ব্যবসায়। শেষে, দেশের আইন-কানুনের একটা সাধারণ জ্ঞান, দেশবাসীর রাষ্ট্রনৈতিক কর্ত্তব্য, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, অর্থব্যবহার এবং দেশের সামাজিক সভ্য-ভব্যতা এবং সে সম্বন্ধে যে সকল প্রতিষ্ঠান তার বিবরণ। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এইরূপ শিক্ষালয়ের সংখ্যা ছিল ৩,৬০০ এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫,৪০,০০০—আর এদের শিক্ষকের সংখ্যা ১,৫০০।

তৃতীয়, কারখানা-স্কুল। এগুলিও উপরি উক্ত শিক্ষালয়ের মতই, প্রভেদ এই যে, এগুলি কারখানাওয়ালারা তাঁদের কারখানায় যে সকল নতুন কর্ম্মী ভর্ত্তি হয়, তাদের জন্য স্থাপন করেছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৭০টি কারখানায় এইরূপ ৯৫টি স্কুল ছিল এবং ছাত্র বা শিক্ষানবিশ ছিল ১৩,৭৩৮। এখানে পড়তে হয় সপ্তাহে ১২ ঘণ্টা করে' তিন বা চার বৎসর। সাধারণ টেকনিকাল স্কুলে যে সকল বিষয় শেখান হয়, এখানেও সেই

সকল বিষয় শেখান হয়—ভিন্ন ভিন্ন রকমের এঞ্জিনিয়ারিং, সাধারণ বিজ্ঞান, জারমান ভাষায় রচনা, হিসাব রাখা, ড্রয়িং, অর্থব্যবহার, নাগরিকের কর্ত্তব্য, সামাজিক সভ্যতার ইতিহাস। এর সঙ্গে আরও আছে—ব্যায়াম শিক্ষা, জিমন্যাষ্টিকস্ এবং ক্রীড়াকৌতুক।

চতুর্থ, রেলওয়ে স্কুল। প্রধানতঃ রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের জন্য। এই স্কুল দু' রকমের—এক রকমে শিক্ষানবিশদের এঞ্জিনিয়ারিং শেখান হয়, অপর রকমে এঞ্জিন চালান শেখান হয়। প্রথম রকমের স্কুলে শিক্ষার সময় চার বছর, দ্বিতীয় রকমে এক বছর। প্রথম রকমে এঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া আরও শেখান হয় শিল্পের উপাদান এবং যন্ত্রাদির ব্যবহার; রেখাঙ্কন (ড্রয়িং), হিসাব রাখা এবং নাগরিকের কর্ত্তব্য। ব্যায়াম অবশ্য এ সকলের সঙ্গে আছেই। দ্বিতীয় প্রকারের স্কুলে শেখান হয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, শিল্পের উপাদান, রেলওয়ের সমস্ত কার্য্য পরিচালনা, ইলেক্‌ট্রিকাল এঞ্জিনিয়ারিং, হিসাব রাখা, রেখাঙ্কন, জারমান ভাষায় রচনা।

পঞ্চম, খনিজ-বিদ্যালয়। ১৮ বৎসরের অনধিক বয়স্ক ছাত্রেরা এখানে শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষার বিষয়—ভূ-বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, খনির কাজ, অঙ্ক, জরিপ, পত্র-ব্যবহার, অর্থ-ব্যবহার, নাগরিকের কর্ত্তব্য, স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং আকস্মিক আঘাতাদিতে প্রথম সাহায্য।

ষষ্ঠ, গ্রাম্য পাঠশালা। যে সকল লোক সাধারণতঃ গ্রামেই বাস করে এবং কৃষিকর্ম্ম করে, তাদের ছেলেদের জন্য। এখানে কৃষিক্ষেত্র, সার, বীজ, পশুপালন, পশুখাদ্য ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়। জারমান ভাষায় রচনা এবং

নাগরিকের কর্ত্তব্য অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে আছে। এগুলি ঠিক কৃষিবিদ্যালয় নয়, সাধারণ পাঠশালা থেকে টেকনিকাল স্কুল পর্য্যন্ত সব রকমই এর মধ্যে আছে।

সপ্তম, শ্রমজীবিনী নারী শিক্ষালয়। এগুলি আছে যে সকল নারী গার্হস্থ্য পরিচর্য্যায়, কৃষিক্ষেত্রে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কর্ম্মশালায়, এবং কলকারখানার কাজে নিযুক্ত আছে, সেই সকল শ্রমজীবিনী নারীদের জন্য। এখানকার শিক্ষণীয় বিষয় গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য এবং শ্রমশিল্প। ১৮ বৎসরের অনধিক বয়স্কা নারীদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন এই সকল শিক্ষালয়ের ছাত্রী। এদের শিখতে হয় জারমান ভাষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, নাগরিকের কর্ত্তব্য, রন্ধন, গৃহকর্ম্ম, সূচিশিল্প, রোগীপরিচর্য্যা, শিশুপালন, সঙ্গীত, ক্রীড়াকৌতুক এবং ব্যায়াম। তা' ছাড়া, হিসাব রাখা, রেখাঙ্কন, শর্ট-হ্যাণ্ড, টাইপরাইটিংও আছে। সপ্তাহে ছ' ঘণ্টা থেকে আট ঘণ্টা করে' তিন বৎসর পড়তে হয়।

এই শিক্ষালয়গুলি, বলা বাহুল্য, সাধারণ প্রাথমিক-বিদ্যালয় নয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে' যারা শিক্ষানবিশি করছে বা কাজে নিযুক্ত হয়েছে এ শিক্ষালয় তাদের জন্য। যাদের কাজ করে, তারা শিক্ষার্থীকে শিক্ষার জন্য শিক্ষালয়ে আসবার সময় দিতে বাধ্য। যে সকল বিষয় এখানকার অবশ্য শিক্ষণীয়, তার মধ্যে, লক্ষ্য করে' দেখবার জিনিষ এই যে, জারমান ভাষা, নাগরিকের কর্ত্তব্য, ব্যায়াম এবং ক্রীড়াকৌতুক সকল প্রকার শিক্ষালয়েই আছে। নাগরিকের কর্ত্তব্য মানে কেবল মিউনিসিপাল কাজ নয়, তার মধ্যে রাষ্ট্রনীতি, অর্থব্যবহার এবং প্রচলিত আইন-কানুনও আছে।

৯

জারমানির নারীশিক্ষার ব্যবস্থাও অতি সুন্দর। পূর্ব্বে যে সকল শিক্ষালয়ের কথা বলেছি তার অনেকগুলিই নরনারী উভয়ের জন্য। তা' ছাড়া আরও অনেকগুলি শিক্ষালয় আছে যেখানে কেবল নারীদেরই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল শিক্ষালয়ে মাতার কর্ত্তব্য, গৃহিণীর কর্ত্তব্য, গৃহস্থের দাসীবৃত্তি, সেলাই, দরজীর কাজ, কাপড় ধোয়া এবং রং করা থেকে আরম্ভ করে', বিজ্ঞান-পরীক্ষাগারের সহকারিণীর কাজ, চিকিৎসা, সমাজ-সেবা প্রভৃতি সকল কাজই শেখান হয়। আর, দেশের লোকও এমনি শিক্ষিত যে, কোনো কাজের জন্য কোনো নারীকে নিযুক্ত করতে হলে এই সকল শিক্ষালয়ের প্রশংসাপত্র না দেখে নিযুক্ত করে না। এগুলিও প্রাথমিক পাঠশালা নয়। প্রাথমিক পাঠশালায় প্রত্যেক বালিকাকে বালকের মত চোদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভ করতে হয়। সে শিক্ষাটা সাধারণ শিক্ষা। তারপর এই সকল শিক্ষালয়ে ব্যবসায়-শিক্ষা লাভ করতে হয়। ব্যবসায়ের মধ্যে আছে রন্ধন, এবং সুন্দর করে' খাবার জিনিষ সাজান ও পরিবেশন করা, ঘর এবং ঘরের আসবাব-পত্রের যত্ন, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিশুপালন, রোগীর শুশ্রূষা, ফুলের

বাগান তৈরি এবং ফুল দিয়ে ঘরদুয়ার সাজান, নাগরিকের কর্ত্তব্য, রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতি, গীতবাদ্য এবং ব্যায়াম। এক কথায় নারীদের সকল কলাবিদ্যা এবং বৃত্তি শেখাবার জন্যই উপযুক্ত শিক্ষালয় আছে।

এই সকল প্রকার শিক্ষাই জারমানির অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক, সার্ব্বজনীন শিক্ষার অন্তর্গত। জারমান সাধারণতন্ত্রবিধির ১৪৫ ধারায় বিহিত হয়েছে—

"The compulsion to attend school is universal. It is realised through the elementary school which consists of at least eight one-year classes and following continuation school which carries the scholars up to the end of the eighteenth year. In both these schools the teaching and educational appliances are provided free."

অর্থাৎ আঠার বছর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালক-বালিকা কোনো-না-কোনো শিক্ষালাভ করতে বাধ্য। প্রথম আট বছর মৌলিক পাঠশালার (Elementary Schools) শিক্ষা। তারপর যে-কোনো-স্থানে, যে-কোনো-কর্ম্মশালায়, যে-কোনো-কাজে শিক্ষানবিশি করুক বা নিযুক্ত হ'ক, তাদেকে কোনো-না-কোনো শিক্ষালয়ে ব্যবসায় শিক্ষার জন্য পড়তে হবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি যেখানে আবশ্যক সেইখানেই এইরূপ শিক্ষালয় স্থাপন করবে। ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী-কারুকারসংঘ এবং ব্যবসায়ীসংঘও আবশ্যক স্থানে এইরূপ শিক্ষালয় স্থাপনের জন্য দায়ী। শিক্ষালয়গুলির পরিদর্শন এবং শাসনের ভার দেওয়া হয়েছে প্রাদেশিক শ্রমশিল্প-ব্যবসায়-বিভাগের এবং

বনবিভাগের ও কৃষিবিভাগের মন্ত্রীদের উপর। কোনো কোনো স্থানে শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর উপরও এ ভার আছে।

জারমানির গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে এই সকল শিক্ষালয় বিদ্যমান। এই শিক্ষালয়ের ছাত্রেরাই আবার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে, শ্রমশিল্পবিষয়ক যন্ত্র এবং যন্ত্রব্যবহারের কৌশল আবিষ্কার করে এবং সেই সকল কৌশল হাতে-হাতিয়ারে প্রয়োগ করে' নানাবিধ পণ্য, বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র থেকে সামান্য খেলনাটি পর্য্যন্ত প্রস্তুত করে' দেশবিদেশে বিক্রী করে। তাই আমরা আমাদের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে লোকালয়ের সর্ব্বত্র এত "Made in Germany" জিনিষ দেখতে পাই।

ফ্রান্সে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আস্তিয়ের আইন (Lois Astier) নামে একটা আইন পাশ হয়। এই আইনের দ্বারা ফ্রান্সের কৃষি বাণিজ্য শ্রমশিল্পশিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করাই এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। দেশে যত শ্রমশিল্প-ব্যবসায়ের কর্ম্মশালা আছে, তার অধিকারীরা তাদের নিযুক্ত ১৮ বৎসরের অনধিক বয়স্ক কর্ম্মচারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য। গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধেক ব্যয় দেয়। অপর অর্দ্ধেক ব্যয় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা দিয়ে থাকে। এই সকল শিক্ষালয়ের মধ্যে যেগুলি প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ে চলে, সেগুলিকে বলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা ন্যাশানাল ইনষ্টিউট। যেগুলি জেলা, নগর, গ্রাম বা গ্রামসমবায়ের দ্বারা স্থাপিত এবং পরিচালিত তাদেকে বলে ডিপার্টমেণ্টাল বা কম্যুনাল ইনষ্টিটিউশন। এই সকল শিক্ষালয়েরও বাড়ী তৈরি করতে, আসবাব এবং যন্ত্রাদি কিনতে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করে। এখানকার শিক্ষক এবং কর্ম্মচারীদের মধ্যে বৈদেশিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও উচ্চ অঙ্গের শ্রমশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু উপরে যে শিক্ষার কথা বলা হল সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূত। ছ'টি রাষ্ট্রীয় এঞ্জিনিয়ারিং স্কুল আছে।

এগুলিকে বলে Schools of "arts and metiers". এখানকার উত্তীর্ণ ছাত্রেরা কল-কারখানার প্রধান এঞ্জিনিয়ার হয়। এখানে ভর্ত্তি হবার পূর্ব্বে স্কুলের শেষ পরীক্ষা (School final) এবং হাতে-হাতিয়ারে যে শ্রমশিল্পের কাজ করেছে, শিক্ষার্থীকে তার সার্টিফিকেট দেখাতে হয়। পড়তে হয় তিন বছর। শিক্ষার বিষয় হচ্ছে বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, যন্ত্রশিল্প (Mechanics) পদার্থবিজ্ঞান, রেখাঙ্কন, ফরাসী ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, হিসাব-রাখা, শ্রমশিল্পবিষয়ক আইন, সামাজিক বার্ত্তাশাস্ত্র, শ্রমিকসংগঠন এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব। একটা বৈদেশিক ভাষাও অবশ্য শিক্ষণীয়।

ব্যবসায় শিক্ষার জন্য পাঁচটি রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় আছে। এখানে বিশেষজ্ঞ নিপুণ কারুকার প্রস্তুত করা হয়। এই কারুকারেরা কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা লাভ করে, পরে কারখানার প্রধান কর্ম্মী হয়। এখানকার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলেও যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের বয়স ১২ থেকে ১৫ বছর। বেতন দিতে হয় না।

এগুলি গেল উচ্চ এঞ্জিনিয়ারিং স্কুল। নিম্ন এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলও অনেকগুলি আছে। নিম্ন এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে সাধারণতঃ চার বছর পড়তে হয়। কিন্তু যারা উচ্চ এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে যেতে চায় তাদেকে তিন বছরের পরে একটা পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়। এখানকার শিক্ষণীয় বিষয় ফরাসী ভাষায় রচনা, ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, পদার্থবিদ্যা, সাধারণ এবং শ্রমশিল্পবিষয়ক রসায়ন, যন্ত্রশিল্প, রেখাঙ্কন, নাগরিকের কর্ত্তব্য নীতি, এবং কারখানায় হাতে-হাতিয়ারে ছুতরের এবং

কামারের কাজ। স্থান বিশেষে, যেখানে চীনা মাটির কাজ, কাপড় বোনা, এবং তাড়িতচালিত যন্ত্রাদির কাজ আছে, সেখানে সে সকলও শিখতে হয়।

এ সকলের চেয়ে অধিক সংখ্যক অবৈতনিক স্কুল আছে হাতে-কলমে ব্যবসায় ও শ্রমশিল্প শিক্ষার জন্য। এখানে ছেলেরা ১২ বছর বয়সের সময় ভর্তি হয়, পড়তে হয় তিন বছর। ছেলেরা যাতে অন্যত্র উচ্চতর কাজে শিক্ষানবিশি করবার উপযুক্ত হয়, এখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষণীয় বিষয় ফরাসী ভাষা, ইতিহাস, পাটিগণিত, বীজগণিত এবং জ্যামিতি। প্রথম দু'বছর এই সকল শিক্ষা দেওয়া হয়। তারপর তৃতীয় বৎসরে ব্যবসায়িক শিক্ষা। যারা শ্রমশিল্পে নিযুক্ত হতে চায় তাদেকে শিখতে হয় কলকব্জার কাজ, নকসা তৈরি, জ্যামিতিক রেখাঙ্কন, এবং তাড়িত বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল বিষয়। যারা ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ করবে তাদেকে শিখতে হয় ভূগোল, হিসাবরাখা, এবং পণ্যদ্রব্যবিষয়ক নানাবিধ তথ্য। তাছাড়া যে ব্যবসায় যেখানে চলতি বেশী, সেখানকার স্থানীয় আবশ্যক অনুসারে ঘড়ি তৈরি, তাড়িত বিজ্ঞানের মোটামুটি জ্ঞান, ছাপাখানার কাজ, টাইপ রাইটিং, বয়ন, হোটেলের কাজ, এবং চীনামাটির কাজও শেখান হয়।

এই সকল স্কুলের অধিকাংশই বালক-বালিকা দুয়েরই জন্য, কোনো কোনো স্কুল কেবল বালিকাদের জন্য। বালিকা-শিক্ষালয় গুলিতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান অবশ্য শিক্ষণীয়। এ ছাড়া বালিকাদের দরজীর কাজ, পোষাক তৈরি, পর্দা তৈরি, লেস তৈরি, কৃত্রিম ফুল তৈরি প্রভৃতিও শেখান হয়।

কৃষি বিদ্যালয় এবং পশু চিকিৎসালয় এ সকল থেকে স্বতন্ত্র। কৃষিশিক্ষার জন্য তিনটি উচ্চ অঙ্গের রাষ্ট্রীয় কৃষিকলেজ আছে। সেখানে যারা শিক্ষা পায়, তারা বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হয়। তাদের কেউ নিজে কৃষিব্যবসায় করে, কেউ গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগে চাকরি করে, কেউ কৃষিবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করে। কৃষিবিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়—জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, কৃষিসম্বন্ধীয় ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, আবহবিদ্যা, কৃষিবিষয়ক এবং সাধারণ রসায়ন ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক বিষয় ; ব্যবসায়িক বিষয়ের মধ্যে—কৃষি, বাগান তৈরি, গাছ-আজ্জান, আঙ্গুরের চাষ ও মদ তৈরি, বন তৈরি, পতঙ্গ-তত্ত্ব, রেশমের চাষ, মৌমাছির চাষ, মাছের চাষ। নাগরিকের কর্ত্তব্য, অর্থনীতি, গ্রাম্যবার্ত্তা, আইন-কানুন, হিসাব রাখা, এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব অবশ্যই আছে। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বয়স হওয়া চাই অন্ততঃ ১৭ বছর, পড়তে হয় তিন বছর। এখানে বিদেশী ছাত্রও নেওয়া হয়। তাদের বেতন বাৎসরিক ৪০০ ফ্রাঙ্ক, প্রায় ৭৫৲ টাকা।

এই সকল উচ্চ কৃষিবিদ্যালয় ছাড়া অনেকগুলি নিম্নতর শিক্ষালয় আছে। কতকগুলিতে বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাড়াও কতকগুলি বিদ্যালয় আছে যাদের অধিবেশন হয় ঋতু পর্য্যায় অনুসারে ; এগুলি আবার দু’ রকমের, এক রকম্ স্থায়ী, এক রকম ভ্রাম্যমান।

স্ত্রীলোকদের কৃষিশিক্ষার জন্যও একটি বিদ্যালয় আছে। সেখানে ষোল বছরের কম বয়সের মেয়ে নেওয়া হয় না। ভর্ত্তি হতে হলে একটা প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। শিক্ষণীয়

বিষয়—জীববিদ্যা, বাগান তৈরি, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, কৃষি, রসায়ন, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বার্ত্তা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, রন্ধন, মিষ্টান্ন প্রস্তুত, পক্ষী-পালন এবং গো-পালন। এখানে শিক্ষয়িত্রীও তৈরি করা হয়। এই শিক্ষয়িত্রীরা ভ্রাম্যমান স্কুলের শিক্ষাদানে নিযুক্ত হয় এবং গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষি এবং কৃষিসম্বন্ধীয় গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেয়। এরা সরকারী ব্যয়ে শিক্ষা পায়।

১১

শ্রমশিল্পব্যবসায় সম্বন্ধে দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা বলেছি। এখন একবার কৃষকদের কথা বলব। কৃষকেরাই শ্রমশিল্পব্যবসায়ের মূল; তারাই প্রথম এবং তারাই প্রধান। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জাতিসংঘের অধীন আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-পরামর্শ-সমিতির (International Labour Conference) জেনেভা অধিবেশনে যখন ভারতের কৃষকদের অভাব-অভিযোগের কথা উত্থাপিত হয়, তখন সমিতি বলেছিলেন যে, ভারতের কৃষকেরা তাদের জোতজমার মালিক, তারা কৃষিকর্ম্মের মজুর নয়; আর ভারতে কৃষিকর্ম্মে কলচালিত যন্ত্রাদির ব্যবহারও বেশী নেই। কাজেই ভারতীয় কৃষকদের শ্রমিক বলা যায় না, এবং এই কারণে আন্তর্জ্জাতিক সমিতি তাদের জন্য কিছু করতে পারলেন না।

এদেশের কৃষকদের জোতজমা ও তার আইন-কানুন সম্বন্ধে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সে কথা আমি আমার 'কৃষকের কথা'য় এবং "প্রজাস্বত্ববিধির সংস্কার" বিষয়ক প্রবন্ধে বলেছি। এখানে তাদের মধ্যেও বেকার-সমস্যাটা কি পরিমাণে গুরুতর হয়ে উঠেছে তারই আলোচনা করব। প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন এবং উত্তরাধিকার-আইনের

ফলে কৃষকের জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে গড়ে সওয়া দু' একর বা ৬৷৷৹ সাড়ে ছ' বিঘা। এই জমিটুকুর উপরেও তাদের সকলের মালিকীস্বত্ব বা দখলীস্বত্ব নেই। যাদের ছিল তাদের অনেকেরই তা' গিয়েছে এবং নতুন দখলীস্বত্ব কারো হচ্ছে না। আর ঐটুকু জমির চাষ-আবাদ করতে বছরে দু' মাসের বেশী সময় লাগে না। অবশিষ্ট দশ মাস কৃষক কর্ম্মহীন হয়ে বসে' থাকে। বলা বাহুল্য, দেশের শতকরা ৭২ জন বছরের মধ্যে দশ মাস বেকার হয়ে বসে' থাকার অর্থ দেশের আর্থিক শক্তির অপচয়। সে অপচয় যে, দেশের কি ভয়ঙ্কর ক্ষতি করছে তা' বর্ণনার অতীত। তার একটা শোচনীয় ফল এই হয়েছে যে, কৃষকেরা প্রায় সকলেই চিরঋণগ্রস্ত। সেদিন কৃষি কমিশনের (Royal Commission on Agriculture) কাছে শ্রীযুক্ত জে, এন, মিত্র রায় বাহাদুর, রেজিষ্ট্রার কো-অপারেটিভ সোসাইটীস্, তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, বাঙলা দেশের কৃষকদের ঋণের পরিমাণ ৬০ ষাট কোটি টাকা! একে ত দেশের জমির উৎ-পাদিকা শক্তির ক্রমেই হ্রাস হচ্ছে, তার উপর জলসেচন ব্যবস্থার অভাবে বার মাস জমিতে চাষের কাজ চলে না; অধিকাংশ স্থলেই একটিমাত্র ফসলের উপর নির্ভর করে' বসে' থাকতে হয়, তারও উপর কৃষক বছরের মধ্যে দশ মাস নিষ্কর্ম্মা! সে যদি না চিরঋণগ্রস্ত হবে ত আর কে হবে? আর, সওয়া দু' একর জমির উৎপন্ন ফসল যে একজন লোকের সমস্ত বছরের সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহের পক্ষে নিতান্তই অল্প তা' বলাই বাহুল্য। সেইজন্য কৃষকের জমিতে যখন কোনো কাজ থাকে না, তখন তাকে অন্য কোনো কাজে নিযুক্ত রেখে তার ক্ষুদ্র আয়ের কিছু বৃদ্ধি করতে পারলে যে তার বিশেষ উপকার করা

হয়, একথা এখন সকলেই বুঝেছেন। কিন্তু সে কাজটা কি হতে পারে? সরকারপক্ষ এবং ইংরেজ ব্যবসাদারেরা বলেন, তারা কল-কারখানায় গিয়ে মজুরি করুক। তা হ'লে কলকারখানার মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে মজুরির হার অল্প হয়ে যেতে পারে এবং তাতে কল-কারখানা-ওয়ালাদের সুবিধা হতে পারে। কিন্তু কৃষকের কিছুমাত্র সুবিধা নেই। প্রথমতঃ কলকারখানার কোনো কাজে সে নিপুণ নয়, তার কোনো শিক্ষা নেই। সে কেবল সাধারণ কুলীর কাজ করতে পারে। কোনো আত্মমর্য্যাদাভিমানী কৃষক তা হতে পারে না; তারপর সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে' সে যে মজুরি পায় তাতে তার নিজের ব্যয়টা নির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সাহায্য করা ত দূরের কথা। তার চেয়ে সহজ প্রতিকার হচ্ছে গৃহ-শিল্প। কিন্তু কোনো প্রকার গৃহশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা দেশে নেই। তারপর বিদেশের প্রতিযোগিতায় কোনো গৃহশিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রীরও ভরসা নেই। নিজের সাংসারিক আবশ্যকের জিনিষ তৈরি করা একমাত্র উপায়। এই আবশ্যকের মধ্যে অন্নের পরেই বস্ত্র প্রধান। চরকায় সূতো কেটে সেই সূতোয় কাপড় বুনতে পারলে বস্ত্রাভাব দূর করা যায়। কিন্তু এর শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো প্রকার সাহায্যেরও ব্যবস্থা নেই। আমি বলছি, সরকারী শিক্ষা ও সাহায্যের কথা, যেমন জারমানি বা ফ্রান্সে আছে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট যদি কাপাসের চাষের জন্য কৃষককে সাহায্য করেন, যদি ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক নিযুক্ত করেন যে গ্রামে গ্রামে কৃষকের বাড়ী গিয়ে এই কাজশিক্ষা দিয়ে আসে তা হ'লে কৃষকের কর্ম্মহীনতা অনেক পরিমাণে দূর হতে পারে।

সম্প্রতি একটি রাজকীয় কৃষি-কমিশন কৃষির উন্নতির জন্য অনুসন্ধান করছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে যদি কৃষিকর্ম্মের বাস্তবিক উন্নতি ও বিস্তৃতি হয় তা হ'লে কৃষকদের মধ্যে বেকার সমস্যাটার সমাধান অনেকটা অগ্রসর হবে। কৃষকের জমির স্বত্বস্বামিত্ব বা তৎ সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা বিষয়ে কমিশন কোনো অনুসন্ধান করবেন না। তাঁদের নিয়োগপত্রে সেরূপ কিছু করতে নিষেধ করে' দেওয়া হয়েছে। সে সকল বিষয় অনুসন্ধান করতে গেলে জমিদার-রায়ত সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় কথা উঠতে পারে যাতে জমিদার খুব খুসী হবেন না। আর এই প্রজার অসন্তোষের দিনে জমিদারকে অসন্তুষ্ট করতেও গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত হতে পারেন না। কাজেই জমিদারের সহিত রায়তের সম্বন্ধ বিষয়ে, প্রজার স্বত্বাধিকার বিষয়ে, কোনো অনুসন্ধান করতে নিষেধ করে' দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কৃষি-বৃক্ষের মূলে জলসেচন না করে' কেবল শাখাপ্রশাখাগুলি কেটে-ছেঁটে সুন্দর করতে বলে' দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে ভাববার বিষয় এই যে, হঠাৎ গবর্ণমেণ্টের এ প্রবৃত্তিটা হল কেন? আমাদের কৃষির এবং কৃষকের দুরবস্থা ত চিরন্তন। গবর্ণমেণ্ট এতদিন জানতে পারেন নি, তা' ত বলা চলে না। কত দুর্ভিক্ষ-কমিশন নিযুক্ত হয়েছে, কত প্রজাস্বত্ববিষয়ক বিধিব্যবস্থার সংশোধন-উপলক্ষে আন্দোলন-আলোচনা হয়েছে, ব্যবস্থাপক সভায় কত তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তখন নিদ্রিত ছিলেন না। তারপর, দ্বৈত-শাসনে শিক্ষার ভারটা যেমন দেশীয় মন্ত্রীর হাতে দেওয়া হয়েছে, কৃষির ভারটাও তেমনি দেশীয় মন্ত্রীর হাতে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার উন্নতি এবং বিস্তারের কথা বললেই যেমন গবর্ণমেণ্ট আমাদের মন্ত্রীর

দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' বলেন, শিক্ষাবিভাগটা এখন তাঁরই অধীন, তিনিই শিক্ষার উন্নতি-অবনতির জন্য দায়ী, কৃষিবিভাগটাও ত তেমনি দেশীয় মন্ত্রীর হাতে। কৃষিসম্বন্ধেও ত তেমনি গবর্ণমেণ্ট বলতে পারতেন যে, সে সম্বন্ধে যা' কিছু আবশ্যক তা' আমাদের মন্ত্রী মহাশয়ই করবেন এবং এই কথা বলে' গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। কিন্তু তা' না করে' অযাচিতভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, এবার একটা রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত করে' কৃষির তথ্য জানবার এবং তার উন্নতি করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের কৃষির উন্নতির জন্য কি করছেন সেটা একবার দেখা আবশ্যক। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে, যে-সকল দেশের খাদ্যদ্রব্য সমুদ্রপথে বিদেশ থেকে আমদানী করে' আনতে হয়, সে-সকল দেশে সমূহ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়েছিল; সমুদ্রপথ নিরাপদ ছিল না, তার উপর জাহাজ সব যুদ্ধসম্ভার বইতে নিযুক্ত ছিল। খাদ্যদ্রব্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়েছিল। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের অবস্থাও খুব শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। অন্য অন্য অনেক দেশের অবস্থাও সেইরূপ হয়েছিল। তাই যুদ্ধের পর সকল দেশেরই প্রথম চেষ্টা হল খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষী না-হওয়া, যথাসম্ভব স্বদেশেই খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা। জারমানি এ বিষয়েও অগ্রণী। জারমানির কার্য্যকলাপ দেখে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সার টমাস মিড্‌লটন একখানি বই লেখেন। বইখানির নাম Recent Development of German Agriculture. বইখানির বিষয় নামেই প্রকাশ। বইখানি প্রকাশিত হবার পরেই ইংলণ্ডে

কৃষির উন্নতি নিয়ে একটা আন্দোলন আরম্ভ হয়। কমন্স সভায় একটা তর্কবিতর্ক হয়। তাতে বোঝা গেল ইংলণ্ডের কৃষির অবস্থা বড় আশাপ্রদ নয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে একটা অনুসন্ধান-সমিতি (Tribunal of Investigation) নিযুক্ত হল। অনুসন্ধানের বিষয় অবধারিত করে' দেওয়া হল—গত পঞ্চাশ বৎসরে অন্য অন্য দেশে কৃষির উন্নতিকল্পে কি উপায় অবলম্বন করা হয়েছে তাই নিরীক্ষণ করে' ইংলণ্ডের কৃষির উন্নতির জন্য কি করা কর্ত্তব্য তারই পরামর্শ দেওয়া। কৃষিসম্পদ-বৃদ্ধির জন্য জমির উৎকর্ষসাধন ও কৃষি-শ্রমজীবীদের ভদ্রভাবে জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্দ্দিষ্ট করে' দেওয়া, তাদের বাসের উপযোগী ঘর তৈরি করে' দেওয়া প্রভৃতিও তার মধ্যে থাকল। এই সমিতির সদস্য ছিলেন অর্থনীতির ইতিহাসলেখক সার উইলিয়াম অ্যাশলি (Sir William Ashley), অর্থনীতিবিশারদ পণ্ডিত ডি, এইচ, ম্যাকগ্রেগর এবং আর একজন অধ্যাপক। তাঁরা জারমানি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হলাণ্ড এবং ডেন-মার্কের কৃষিসম্বন্ধীয় রাষ্ট্রনীতি এবং কৃষিকর্ম্ম-প্রণালী সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করে' ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে-মাসে তাঁদের রিপোর্ট দিয়েছেন। রিপোর্টে প্রকাশ, ইংলণ্ডে কৃষিকর্ম্মের জন্য যে জমি আছে তার পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে, এবং কৃষকদের কৃষির উন্নতির জন্য তেমন আগ্রহ নেই। সার উইলিয়াম অ্যাশলি বলেন, চাষের জমির পরিমাণ আর কমতে দেওয়া উচিত নয়; ইংরেজের জাতীয় স্বার্থের জন্য চাষের জমি রক্ষা করতে হবে, আর কৃষককে পরামর্শের দ্বারা এবং অন্য প্রকার সাহায্য দ্বারা কৃষির উন্নতি করতে উপদেশ দিতে হবে। উপযুক্ত সাহায্য না পেলে কৃষক নিজে কোনো উন্নতি করবে না।

এর জন্য অবশ্য গবর্ণমেণ্টকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হবে। দেশের কৃষিসম্পদের উন্নতিবিধানের গুরুত্ব দেশের লোকের এখনও হৃদয়ঙ্গম হয়নি। সেটা লোককে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সেজন্য যে-কোনো-উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তা' করতে হবে। অধ্যাপক ম্যাক-গ্রেগর বলেন, তার অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, যুদ্ধের সময় এই কৃষিসম্পদ ইংরেজ জাতিকে রক্ষা করবে—"the main and dominating reason is defence in time of war." তিনি অনুমান করেন এর জন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হবে বাৎসরিক ৭০ লক্ষ পাউণ্ড বা ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (তখনকার হিসাবে এক পাউণ্ড ১৫৲ টাকার সমান ধরে') কিন্তু ব্যয়ভার যতই গুরু হ'ক, জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য তা' বইতেই হবে—"the burden would have to be shouldered if it (the nation) desired to secure certain national objects."

তারপর জমিসম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থায় যে সকল সংস্কারের আবশ্যক, অনুসন্ধান-সমিতির রিপোর্টে তা' বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে জমিতে কৃষকের যাতে স্থায়ী স্বত্ব জন্মে তাই প্রধান। কিন্তু ইংলণ্ডের বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থায় কৃষককে জমির স্থায়ী স্বত্ব দেওয়া সহজসাধ্য হবে না। সার উলিয়াম অ্যাশলিঃ বলেন, যদি তা' সহজসাধ্য না হয় তা হ'লে কৃষকের স্বত্ব যথাসম্ভব নির্ব্বিঘ্ন এবং নির্ব্বিবাদ করে' দিতে হবে। কৃষককে সংশয়বর্জ্জিত ভাষায় বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আইন অনুসারে সে জমির মালিক না হলেও কার্য্যতঃ সে জমির সর্ব্বেসর্ব্বা। জারমানি, বেলজিয়াম এবং ডেনমার্কে বড় বড় জোত ভেঙে ছোট ছোট জোত করে' কৃষককে তার স্বত্বাধিকারী করে'

দেওয়া হয়েছে। কৃষক সেই জমিতে মজুর নিযুক্ত না করে' নিজের পরিবারস্থ লোকের সাহায্যেই চাষ আবাদ করে। এইরূপে ঐ সকল দেশে কৃষির এত উন্নতি হয়েছে। ইংলণ্ডেও ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করবার জন্য অনুসন্ধান-সমিতি পরামর্শ দিয়েছেন। *

* অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের Economic Development.

অনুসন্ধান-সমিতির পরামর্শ এই যে, এইরূপ ক্ষুদ্র জোতের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ একরের কম নয় এবং আশী একরের বেশী নয়। তার কারণ এর চেয়ে কম জমিতে একজন কৃষকের ভদ্রভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা চলে না। এইরূপ ক্ষুদ্র জোত (Small holding) তৈরি করতে হবে বড় বড় জমিদারীকে খণ্ড খণ্ড করে', আর তার উপর মালিকী-স্বত্ব দিয়ে কৃষককে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জমিদারের সহকারিতায় এ কাজ গবর্ণমেণ্টকেই করতে হবে। অন্য কারো দ্বারা তা' হতে পারে না। দু' উপায়ে এটা হতে পারে—প্রথম, জমিদারের কাছ থেকে সমস্ত জমি কিনে নিয়ে প্রজার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বিলি করে' দেওয়া; দ্বিতীয়, জমি না কিনে স্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে ঐরূপ বিলি করে' দেওয়া। ইংলণ্ডে এর জন্য একটা আইন আছে—The Small Holdings and Settlements Act of 1908. অনুসন্ধান-সমিতি এর জন্য ঐ আইন সংশোধিত এবং পরিবর্ত্তিত করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

জমির ভাগ-বণ্টন করে' এইরূপ ক্ষুদ্র জোতের সৃষ্টি করা এবং তাতে মালিকী-স্বত্ব দিয়ে চাষের জন্য কৃষককে দেওয়া,

সমানাধিকারবাদীদেরই (communist) কল্পনা। বর্ত্তমান রুষিয়াতে অনেকটা এইরূপ হয়েছে। বলশেভিক রুষিয়ার সব জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করে' নিয়ে একটি লোকের ভরণপোষণের জন্য যতটা জমি আবশ্যক প্রত্যেক কৃষককে ততটা জমি দেওয়া হয়। কৃষক তাতে নিজের পরিবারস্থ লোকের সাহায্যে চাষ-আবাদ করে। কৃষিকর্ম্মের জন্যই হ'ক বা অন্য কাজের জন্যই হ'ক, রুষিয়াতে মজুরি দিয়ে শ্রমিক নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ। সেরূপ করলে সোভিয়েটের সদস্য-নির্ব্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এর মূলে এই নীতি আছে যে, একজনকে আর একজনের বেতনভোগী ভৃত্য হতে দিলেই সমাজে ধনী-শ্রমিক বিবাদ উপস্থিত হবে এবং ধনবৈষম্যের যত কিছু দোষ সবই উপস্থিত হবে। সেইজন্য রুষিয়ার বিধি এই ঃ—

"3. The Congress of the Soviets of Workers', Soldiers', and Peasants' delegates, considering it to be its fundamental duty to abolish all exploitation of one set of human beings by another and the division of society into classes ; to suppress summarily all exploiters ; to establish a socialist organisation of society and the triumph of socialism in all countries, further decrees :

(a) With a view to carrying through the socialisation of land, all private property in land is abrogated, and all land is declared to be the common property of the people, and is handed over to the workers without compensation to its previous owners on basis of equalised use."

* * * *

"64. The following citizens of both sexes of the Russian Socialist Federal Republic......have the right to vote for, and to be elected to, the Soviets etc etc.

(a) All those who earn a living by productive work of social usefulness..............workers and employees of all kinds occupied in trades, commerce, farming etc, peasants and Cossack agriculturists, *provided they do not employ hired labor for profit.*

"65. The following have no right to vote and cannot be elected, even though they possess qualifications mentioned above :

(a) Persons employing hired labor for profit.

(b) Persons living on unearned incomes, such as interest on capital, incomes derived from businesses, revenues from property."

ইংলণ্ডের অনুসন্ধান-সমিতি সামান্য পরিবর্ত্তন করে' এই ব্যবস্থাই ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সমানাধিকারবাদের নাম করেননি; রুষিয়ার সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নাম ত নয়ই। ইংলণ্ডের জমিসম্বন্ধীয় এই নীতি সাক্ষাৎভাবে রুষিয়া থেকে না নিয়ে ডেনমার্কের যোগে একটু নরম করে' নেওয়া হয়েছে। ডেনমার্কের কৃষকদের অবস্থাও বড় ভাল ছিল না। তার প্রধান কারণ ছিল জমির পরিমাণের অল্পতা। সুতরাং জমির পরিমাণ যাতে বাড়িয়ে দেওয়া যায় তারই চেষ্টা হল আগে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এ সম্বন্ধে একটা আইন পাশ হল। এই আইনের দ্বারা প্রত্যেক কৃষকের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে প্রায় ত্রিশ বিঘা করে' দেওয়া হল। জমি কিনতে যে

টাকার আবশ্যক হল তার শতকরা ৯০৲ নব্বই টাকা দিলে গবর্ণমেণ্ট, সুদ শতকরা বার্ষিক ৩৲ তিন টাকা। প্রথম পাঁচ বৎসর এইরূপ থাকল, তারপর সুদের হিসেবে শতকরা আর এক টাকা বেশী নেওয়া হচ্ছে। দেনাটা এই রকম করে' শোধ হয়ে গেলেই কৃষক তার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার পাবে। এই উপায়ে কেবল যে, যাদের জমি অল্প ছিল তাদের জমি বেশী হল তাই নয়, যাদের জমি ছিল না, দিনমজুরি করে' জীবিকানির্ব্বাহ করত, তারাও জোতদার কৃষক হয়ে উঠল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই বিধি সংশোধিত এবং পরিবর্ত্তিত হয়ে আবার একটা নতুন আইন হল। তাতে কৃষকের আরও অনেক ক্ষুদ্র জোতের সৃষ্টি করা হল। কৃষকেরা এই সব ছোট ছোট জোতের মালিকীস্বত্ব পেলে বটে, কিন্তু বিধি হল তারা জোত কমাতে পারবে না, বাড়াতেও পারবে না, ভাগ করতে পারবে না, অন্য জোতের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারবে না, জোতের কোনো অংশ কাউকে বিলি করতে পারবে না, তার উপর বাড়ী তৈরি করে' ভাড়া দিতে পারবে না। অর্থাৎ প্রকারান্তরে কৃষককে বুঝতে হবে যে, তার মালিকী-স্বত্বটা কেবল চাষের জন্য, আসলে সম্পত্তিটা রাষ্ট্রের। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ ক্ষুদ্র জোতের সংখ্যা হয়েছিল প্রায় দশহাজার আর গবর্ণমেণ্টকে তার জন্য ব্যয় করতে হয়েছিল ৩০ ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড বা (পনর টাকায় পাউণ্ড হিসেবে) ৪,৫০,০০,০০০৲ চার কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

জারমানির জমিসংক্রান্ত এইরূপ ব্যবস্থা আরও আগে (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে) আরম্ভ হয়। গত ইউরোপীয় যুদ্ধের পূর্ব্বেই

জারমানিতে মালিকীস্বত্ববিশিষ্ট ক্ষুদ্র জোত ছিল ২০,০০০ কুড়ি হাজার, আর তার জন্য জারমান গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করেছিলেন ১০,৮০,০০,০০০৲ দশ কোটি আশী লক্ষ টাকা। যুদ্ধের পর জারমান সাম্রাজ্য সাধারণ-তন্ত্রে পরিণত হলে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এ সম্বন্ধীয় আইন সংশোধিত হয়ে কৃষকের আরও সুবিধা হয়েছে। জারমানিতে এইরূপ ক্ষুদ্র জোতের পরিমাণ এখন হয়েছে ১২০ বিঘা, ডেনমার্কে ৩০ বিঘা ছিল, এখন প্রস্তাব হয়েছে একে বাড়িয়ে ৪৫ বিঘা করে' দেওয়া হবে। ইংলণ্ডের নতুন ব্যবস্থায় এইরূপ জোতের পরিমাণ হবে ৫০ থেকে ৮০ বিঘা। আর বাঙলার কৃষকের জমির পরিমাণ সওয়া দু'একর বা সাড়ে ছ'বিঘা। তাতে তার মালিকী-স্বত্ব ত নেই-ই, অন্য কোনো স্বত্বেরও একান্ত অভাব; তাতে সে চাষ করে, তারই মত অনশনব্রতী বা অর্দ্ধাশনব্রতী দুটি গোরু দিয়ে; তাতে জল-সেচনের ভার সম্পূর্ণরূপে দেবতার উপর; আর সরকার তার বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য ব্যয় করেন বছরে একর প্রতি অর্দ্ধ আনা!—

"The Imperial Department of Agriculture with its head quarters at Pusa is maintained at a cost of little more than Rs 9 lakhs; while the total expenditure of all the Provincial Departments amounts to but little over £10,00,000—a total charge on the country of $\frac{1}{3}$d per acre per annum." *

এই জমিটুকুর চাষের বৈজ্ঞানিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি-বিধান করবার উপায় আবিষ্কার করতে এসেছেন রাজকীয় কৃষি-

* India in 1923-24 by Prof. Rushbrook Williams, pp. 147-48.

কমিশন। সওয়া দু' একর জমির ফসলে কৃষকের অনশন বা অর্দ্ধাশন নিবারণ হয়, বস্ত্রাভাব বিদূরিত হয়, ম্যালেরিয়া তার ভগ্ন-কুটীর ত্যাগ করে' চলে' যায়, তার ছেলেমেয়েদের অজ্ঞানঅন্ধকার ঘুচে' যায়, বছরের মধ্যে দশ মাসের কর্ম্মহীনতার স্থানে বার মাসের যথেষ্ট কর্ম্ম থাকে, এমন কৃষি-বিজ্ঞানের কথা ত এদেশে এখনও শোনা যায়নি। তবে বিজ্ঞানের অসাধ্য নাকি কিছু নেই!

কিন্তু, ইংলণ্ডে বড় বড় জোত ভেঙে ছোট ছোট জোত করে' কৃষির উন্নতির কথা বলছিলাম। তাই করতে পারলেই কি ইংলণ্ডের অন্নকষ্ট ঘুচবে? সমস্ত ইংলণ্ডে এত চাষের জমিও নেই, চাষী কৃষকও নেই যে, সমস্ত ইংরেজজাতিকে শান্তির সময়েই হ'ক আর যুদ্ধবিগ্রহের সময়েই হ'ক, স্বদেশোৎপন্ন অন্ন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তাই এখন ইংরেজ স্বদেশের কথা না বলে' স্ব-সাম্রাজ্যের কথা বলে। আর, ভারতবর্ষ নিয়েই এই সাম্রাজ্য। ভারতবর্ষ—অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা বা দক্ষিণ আফ্রিকার মত স্বাধীন উপনিবেশ নয়। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন, ইংলণ্ডের আজ্ঞানুবর্ত্তী। ভারত-বর্ষের কৃষির উন্নতিবিধান করলে ইংলণ্ডেরও অন্নসংস্থান করা হয়। তাই কি ইংলণ্ডের Tribunal of Investigationএর অনুকরণে এ দেশের জন্য Royal Commission on Agriculture নিযুক্ত হয়েছে? ইংলণ্ডের Tribunal of Investigation তাঁদের অনুসন্ধান শেষ করে' রিপোর্ট দিয়েছেন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। তার পরেই দেখতে পাওয়া যায় পার্লামেণ্টে ভারতের কৃষির কথার আলোচনা হচ্ছে। তখন শ্রমিক দলের মন্ত্রিত্ব। অল্প দিনের মধ্যেই সে মন্ত্রিত্ব শেষ হল। রক্ষণশীল দলের মন্ত্রিত্ব লাভ হল। লর্ড

বার্কেনহেড ভারতসচিব হয়েই ভারতের ভূমিলক্ষ্মীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন এবং ভারতীয় কৃষকের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিলেন। তার পরেই ভারতগবর্ণমেণ্টের সহিত এই বিষয়ে তাঁর পত্রব্যবহার এবং এক বৎসরের মধ্যেই রাজকীয় কৃষি-অনুসন্ধান-সমিতির নিয়োগ। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য দেখলে মনে হয় ইংলণ্ডের Tribunal of Investigation এবং ভারতের Royal Commission on Agriculture পরস্পর নিঃসম্বন্ধ নয়। ভারতে ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্য খাইবারপাস-রেলওয়ে, সিঙ্গাপুরে নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর থানা হচ্ছে। ভারতের কৃষির উন্নতিও কি সেই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত? দেশরক্ষার জন্য নৌবাহিনী যেমন আবশ্যক, কৃষকবাহিনীও অবশ্য তেমনি আবশ্যক।

১৩

এ পর্য্যন্ত যা' বলেছি তা' থেকে বোঝা যাবে যে, ভারতবর্ষ আগে শিল্পবাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভারতের শিল্পবাণিজ্যসম্পদই বিদেশীর লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইংরেজদের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও সেই লোভেই এদেশে এসেছিলেন। তারপর সেই শিল্পবাণিজ্যসমৃদ্ধ ভারত কেমন করে' কৃষিপ্রধান দেশ হয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে এবং হচ্ছে তা'ও বলেছি। এখন একবার দেখা যা'ক, এই অবস্থায় আমাদের দেশের লোকগুলি কি করে' জীবিকানির্ব্বাহ করে; তা হ'লেই দেশের কর্ম্মহীনতার যথার্থ মাত্রাটা ভাল করে' বুঝতে পারা যাবে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে গবর্ণমেণ্ট বলেন, এই দেশটা বস্তুতঃ কৃষিকর্ম্মের দেশ—"Essentially an agricultural country." এ দেশের ৩১,৮৯,৪২, ৫০০ (একত্রিশ কোটি, ঊন-নব্বই লক্ষ, বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচ শ') লোকের মধ্যে ২২,৪০,০০,০০০ (বাইশ কোটি চল্লিশ লক্ষ)—লোক বা শতকরা ৭১ জন কৃষির উপর নির্ভর করে। শ্রমশিল্পের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে শতকরা দশ জন; এই শ্রমশিল্পের ভিতর বড় বড় কলকারখানার কাজ নেই, এর মধ্যে আছে কেবল গৃহস্থালির সামান্য সামান্য জিনিষপত্র তৈরি করা।

বড় বড় কলকারখানার কাজে নিযুক্ত আছে শতকরা এক জন মাত্র। ব্যবসায়বাণিজ্য শতকরা ছ' জনের চেয়ে কিছু কম লোককে অন্ন দেয়। জিনিষপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার কাজে (transport) নিযুক্ত আছে শতকরা দু' জন, আর দেশের রক্ষা ও শাসনকার্য্যে পরিপুষ্ট হচ্ছেন ৪৮,২৫,৪৭৯ আটচল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার চারশ উনআশী জন বা শতকরা দেড় জন মাত্র।

ভূমিলক্ষ্মী যাদের অন্ন দান করেন, সেন্সাস রিপোর্ট তার হিসাবের মধ্যে জমিদারকেও ধরেছে, যদিও তাঁরা কৃষিকর্ম্মের কোনো ধার ধারেন না। তাঁদের ম্যানেজার, গোমস্তা প্রভৃতিও এরই মধ্যে আছেন। বাঙলায় ১৯১১ খৃষ্টাব্দের তুলনায় জমিদারের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ন' জন; আর কৃষকের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা তিন জন মাত্র। এর কারণটা দুর্জ্ঞেয় নয়। জমিদারের অন্নবস্ত্রের অভাব নেই; বাসগৃহও ভাল; অনেকে ত পল্লীগ্রাম ত্যাগ করে' একেবারে নাগর হয়েছেন; ভূমিলক্ষ্মীর দান পাছে ভূমিতে ফিরে যায়, সেই ভয়ে নাগরিক আমোদ-আহ্লাদেই সেটা ব্যয় করে' কৃতার্থ হন। কাজেই তাঁদের বংশবৃদ্ধিটা অনেক পরিমাণে বাধাহীন বিঘ্নহীন হয়ে ভূ-ভার বৃদ্ধি করেছে। আর, যমালয়-ভিন্ন-গত্যন্তর-হীন কৃষক ম্যালেরিয়ার আকর ডোবা এবং জঙ্গলে পরিবৃত পল্লীগ্রামের ভগ্ন কুটীরে বাস করে' অর্দ্ধাশন বা অনশনের দ্বারা ব্যাধিমন্দির শরীরকে আরও রোগগ্রস্ত করে' যথানিয়ম জমির কর দিচ্ছে। অতএব জীবধর্ম্মানুসারে জমিদারের বংশবৃদ্ধি এবং কৃষকের বংশক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

এই কৃষকদের জোতজমা সম্বন্ধে সেন্সাস রিপোর্ট বলে, ব্রিটিশ

বাঙলায় চাষের জমির পরিমাণ ২,৪৪,৯৬,৮০০ একর; আর চাষীর সংখ্যা ১,১০,৬০,৬২৯; অর্থাৎ প্রত্যেক চাষীর জমির পরিমাণ সওয়া দু' একরের চেয়ে কিছু কম। কৃষকের দারিদ্র্যের হেতু এইখানে। সেন্সাস রিপোর্টের ভাষায়,—

"This means only 2·215 acres per worker. It is in such figures as these that the explanation of the poverty of the cultivator lies. The cultivation of less than 2¼ acres of land cannot employ a man for more than a comparatively small number of days in the year. The cultivator works fairly hard for a few days when he ploughs his land and puts down his crops and again when he harvests them, but for most of the year, he has little or nothing to do. * * * The Bengali cultivator has not nearly as much to do as will fill his time. This is the root cause of his poverty. In Bengal the holdings have been so minutely subdivided that there is not enough work for cultivators, but on the other hand there is no other work to which they can turn their hands."

এখন একবার দেখা যাক এই বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য কি করা হচ্ছে এবং কি করা উচিত। প্রথমেই মনে হয় এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোনো কর্ত্তব্য আছে কি না? অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, সকল বিষয়েই আমাদের গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয়। অন্য অন্য বিষয়ের মত এ বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা বৃথা; অতএব, গবর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ হয়ে আমাদের নিজেদেরই সে চেষ্টা করতে হবে। এঁদেকে গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে দ্বৈতবাদী বলা যেতে পারে। এঁরা মনে করেন, দেশের লোক আর দেশের গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র ও পৃথক। গবর্ণমেণ্টও দেশের লোক সম্বন্ধে দ্বৈতবাদেই বিশ্বাসবান বলে' মনে হয়। গবর্ণমেণ্টের এই বিশ্বাস প্রকট হয়েছে প্রাদেশিক দ্বৈতশাসনে। কিন্তু অদ্বৈতবাদীও অনেক। এই রাষ্ট্রনৈতিক অদ্বৈতবাদীরা আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদীদের মত মনে করেন তাঁরাই সেই গবর্ণমেণ্ট, তাঁদের গবর্ণমেণ্টের সেবা, উপাসনা বা প্রার্থনা নেই এবং বলেন যে, গবর্ণমেণ্টেরও মনে করা উচিত যে তাঁরা কেবল সম্মিলিত প্রজাশক্তির আধারমাত্র, সচেতন প্রজার ইচ্ছাকে গবর্ণমেণ্ট যেমন অবহেলা করতে পারেন না, প্রজাও তেমনি গবর্ণমেণ্টকে অস্বীকার করতে পারে না। গবর্ণ-

মেণ্টের অস্তিত্বকে স্বীকার করতেই হবে। এত বড় পুঞ্জীকৃত শক্তির আধারকে অস্বীকার করে' লাভ নেই। কেবল গবর্ণমেণ্টের মগ্ন চৈতন্যকে জাগ্রত করে' দিতে হবে যে, তাঁরা স্বতন্ত্র নন, পৃথক নন্। এই বেকার-সমস্যা সম্বন্ধেও গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য আছে।

দেশের প্রতিনিধিরা একবার গবর্ণমেণ্টের এই কর্ত্তব্যটা তাঁদেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যে, দেশের মধ্যবিত্ত লোকদের বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে (the problem of unemployment among the middle classes) অনুসন্ধান করবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হ'ক ; কমিটিতে যেন বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যা বেশী থাকে ; এবং তাঁরা যথাবশ্যক অনুসন্ধান করে' সমাধানের উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ দেন। আয়েঙ্গার মহাশয় বলেন, এর সমাধানের দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টেরই, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে কিছু করেননি। তিনি আরও বলেন, গবর্ণমেণ্টের আর্থিক নীতির ফলে মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে দারিদ্র্যের একশেষ হয়েছে। শিক্ষিত দরিদ্রের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এ সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা একবার বাঙলা গবর্ণমেণ্টের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। সে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হলে বাঙলার পল্লীগ্রামগুলির পুনঃসংস্কার এবং পুনর্গঠন করে' মধ্যবিত্ত শিক্ষিত কর্ম্মহীন অনেক লোকের কর্ম্মহীনতা দূর করা যেতে পারত। কিন্তু বাঙলা গবর্ণমেণ্ট চিত্তরঞ্জনের সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এখন ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সমস্যার সমাধান করুন।

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। আয়েঙ্গার মহাশয়

দেশব্যাপী কর্ম্মহীনতার মধ্যে 'মধ্যবিত্ত'দের কর্ম্মহীনতাই বেছে নিয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রতিকারের জন্য উপস্থিত করেছেন। ইংরেজীতে যাকে middle class বলে, আমরা তার অনুবাদ করেছি 'মধ্যবিত্ত'—যদিও বিত্ত হিসেবে আমাদের দেশের তাঁরা 'মধ্য' নন, একবারে 'তৃতীয়' শ্রেণীর চেয়েও অধম। যা হ'ক, কথাটা যখন চলিত হয়ে গিয়েছে তখন তাই ব্যবহার করা যা'ক। তাঁরা হচ্ছেন ছোট বড় চাকরিওয়ালা, ব্যবসাদার, দোকানদার, উকীল-মোক্তার, ডাক্তার-কবিরাজ প্রভৃতি ভদ্রলোক। তাঁদেরই শিক্ষিত সন্তানদের জন্য কর্ম্ম আবশ্যক এবং তারই জন্য এই চেষ্টা। তাঁরা অবস্থা অনুসারে গ্রাম্য স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর-উপাধি পর্য্যন্ত বিদ্যা লাভ করে', বা লাভ না করতে পেরে, চাকরি বা চাকরির অভাবে বিদ্যা-বুদ্ধি মাত্র মূলধন নিয়ে যে ব্যবসা হতে পারে তাই অবলম্বন করবার চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য অধিকাংশেরই চেষ্টা নিষ্ফল হয়। নিষ্ফল হবারই কথা; কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য সন্তান-জনন এখন অবাধ, অনিয়ন্ত্রিত। যতদিন এই কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত করতে না পারা যাবে, ততদিন বহু সন্তানবান্ দরিদ্রের সন্তানের মতো তাদের মধ্যেও পুষ্টিজনক প্রচুর খাদ্যের অভাবে, শারীরিক ও মানসিক অকাল মৃত্যু বেড়ে যাবে। প্রতি বৎসর যত হাজার ছেলে স্কুল-কলেজ থেকে পাশ হয়ে বা 'ফেল' হয়ে বা'র হয়, তত হাজার চাকরি প্রতি বৎসর খালি হয় না। কাজেই সকলের ভাগ্যে সফলতা অসম্ভব। একটা সত্য দৃষ্টান্ত দি। গত বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন অফিসগুলিতে চল্লিশটি কেরাণীর পদ খালি হবার সম্ভাবনা ছিল। তার জন্য একটা পরীক্ষা

হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের শেষে দিল্লীতে সেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার্থী ছিলেন সাত শ'—তার মধ্যে এম্-এ, এম্-এস্-সি অনেক; বি-এ, বি-এস্-সির নীচে কেউই নয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন বত্রিশটি! অবশিষ্ট ৬৬৮টি নিষ্ফলা যাত্রা শেষ করে' নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিও এইরূপ পরীক্ষা নেন, এবং শতকরা ৯৫ জনকে 'ফেল' করে' বাড়ী ফিরে যেতে বলেন। স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাদানে অনেক অপচয় হয়। কথাটা অতি সত্য। একবার একটু গভীর ভাবে ভেবে দেখুন এতগুলি B. A., B. Sc. এবং M. A., M. Sc. সামান্য অবস্থার অভিভাবকদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে, অনটনগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা দরিদ্র করদাতাদের ব্যয়ে বিজ্ঞান শিখে সামান্য চাকরীর জন্য লালায়িত! আর চাকরিটাই বা কি? যাতে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই, যাতে চর্চ্চার অভাবে বিজ্ঞানের যে সামান্য জ্ঞানটুকু আয়ত্ত হয় সেটুকুও মনের উপর কোনো দাগ না রেখে সম্পূর্ণ অপগত হয়ে যায়। পুলিশের এবং আবগারীর দারোগাগিরিতে M. Sc., B. Sc. দেখা গিয়েছে; M. Sc., B. L. বা B. Sc., B. L. অনেক আছেন। যাঁরা কোনো কালে কোনো প্রকারের বিজ্ঞানচর্চ্চা করবেন না বা করবার সুবিধা পাবেন না, তাঁদেকে কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সুবিধা দেবার জন্য বিজ্ঞান শেখাতে বিদ্যালয়ের, গবর্ণমেণ্টের এবং অভিভাবকের কত সময়, শক্তি এবং অর্থের অপচয় হয় তা' একবার দেশের লোকের বিশেষ করে' দেখবার সময় উপস্থিত হয়েছে। দেশের লোককে দেখতে বলছি এইজন্য যে, যে-অর্থটা এইরূপ উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্য

ব্যয় হচ্ছে, সেটা কেবল শিক্ষার্থীর অভিভাবকের নয়। দরিদ্র করদাতা নিজের ছেলেকে মূর্খ করে' রেখে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সন্তানের উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্য বাৎসরিক ১২১৷৵০ দিয়ে থাকে। যে ভদ্রসন্তানটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারেন না, স্কুলেই লেখাপড়া শেষ করেন তাঁর জন্যও করদাতা দিয়ে থাকেন ৬৸৵০। আর যে গরীবের ছেলেটি প্রাথমিক পাঠশালায় শিক্ষালাভ করতে যায়, তার জন্য করদাতাকে দিতে হয় ১৸৵০ মাত্র। এই সঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ করতে হবে। দেশের জনসাধারণের তুলনায় ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা, পুরুষ শতকরা ১৬টি, স্ত্রীলোক ২টি মাত্র, আর এঁরাই হচ্ছেন শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। সরকারী চাকরিতে এঁদের সংখ্যা শতকরা দেড়জন। এঁদেরই কর্ম্মহীনতা দূর করবার জন্য এত চেষ্টা হচ্ছে। আর যাদের সংখ্যা শতকরা ৭২ জন, যারা সমাজশরীরের মেরুদণ্ড, যারা কর্ম্মের অভাবে বারমাসের মধ্যে দশমাস নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে' থেকে দেশের শক্তির অপচয় ঘটাচ্ছে এবং দারিদ্র্য বাড়াচ্ছে, তাদের কর্ম্মহীনতা দূর করবার কোনো চেষ্টা নেই! সময়ে অসময়ে, স্থানে অস্থানে দেশের উন্নতির কথা আমরা ক্রমাগত শুনছি। কিন্তু উন্নতিটা কার? এই তথাকথিত ভদ্রলোকের। আর্থিক উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, যতকিছু উন্নতি আছে, সব এই ভদ্রলোকের জন্য। অথচ এঁরা দেশের লোকের একটা সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। কর্ম্মহীনতা দারিদ্র্যের জননী; দারিদ্র্য একটা সামাজিক সংক্রামক ব্যাধি। সমাজের অধিকাংশ যতক্ষণ এই ব্যাধিগ্রস্ত থাকবে, ততক্ষণ ভগ্নাংশ তা' থেকে নিস্তার পাবে না।

১৫

শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের প্রস্তাবের কথা বলছিলাম। তাঁর প্রস্তাবটা ছিল কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের বেকার সমস্যা নিয়ে। স্যর শিবস্বামী আয়ার প্রস্তাবটিকে আর একটু সঙ্কুচিত করে' একটি সংশোধন প্রস্তাব করলেন, বললেন 'মধ্য শ্রেণী'র মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের মধ্যে অনেকে কর্ম্মহীন হয়ে বসে' আছে। যে কমিটি নিযুক্ত করবার কথা হচ্ছে তাঁরা যেন এই শিক্ষিতদের কর্ম্মহীনতা দূর করবার উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে এই শিক্ষিতদের শিক্ষা-প্রণালী অনেক পরিমাণে তাঁদের অকর্ম্মা হবার হেতু, অতএব শিক্ষা-প্রণালীতে কিছু রদ-বদল করা আবশ্যক। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগটা এখন হস্তান্তরিত হয়ে আমাদের দেশীয় মন্ত্রীর অধীন। সুতরাং শিক্ষাপ্রণালীর কোনো সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করতে হলে আমাদের আবেদন নিবেদন প্রভৃতি যা' কিছু করতে হয়, তা' করতে হবে আমাদের মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে। গবর্ণমেণ্ট পাছে এই উত্তর দিয়ে প্রস্তাবকর্ত্তাকে নিরস্ত করেন এই আশঙ্কায় স্যর শিবস্বামী বললেন—শিক্ষা, কৃষি এবং শ্রমশিল্প এই কয়টি বিষয়ই ত এখন হস্তান্তরিত ; তা হ'লে কৃষির উন্নতির জন্য যদি রাজকীয়

কৃষি কমিশন নিযুক্ত হতে পারে, ত শিক্ষা এবং শ্রমশিল্পের জন্য কমিটি নিয়োগের আপত্তি কি? শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও শিক্ষিত যুবকদের হিতৈষী এবং শুভানুধ্যায়ী। তিনি বলেন আমাদের সমাজে এখন হাতে-হাতিয়ারে কাজ করাটা তেমন গৌরবজনক হয়নি; যতদিন তা না হয়, ততদিন আমাদের শিক্ষিত যুবকদের জন্য যাতে বিদ্যাবুদ্ধির দরকার এমন কাজ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রস্তাবিত কমিটিকে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে বলা হ'ক।

মিঃ নারায়ণদাস বলেন, সৈনিকবিভাগে, নৌবিভাগে, এবং আরও অনেক সরকারী কর্ম্মবিভাগে ভারতবাসীর প্রবেশ নিষিদ্ধ আছে। সেই সকল বিভাগের দ্বার খুলে দিলে অনেক ভারতবাসীর কর্ম্মহীনতা দূর হতে পারে।

মিঃ সিদ্দিক হুসেন জনসাধারণ থেকে 'মধ্য শ্রেণী'র শিক্ষিত যুবকদের বিশেষ করতে চান না। তিনি বলেন সমস্ত দেশবাসীই যখন অনশনক্লেশ সহ্য করছে, তখন কেবল 'মধ্য শ্রেণী'র শিক্ষিত লোকগুলির কাজ-কর্ম্মের ব্যবস্থা করা ন্যায়সঙ্গত নয়। প্রস্তাবিত কমিটির অনুসন্ধানের পরিসর বাড়িয়ে দিয়ে যাতে সকল শ্রেণীর লোকেরই কর্ম্মের অভাবজনিত দুঃখ দূর হয় তারই ব্যবস্থা করতে হবে।

স্যর উইলোবি কেরী বলেন, এ সম্বন্ধে কিছু করতে হলে মূলধন চাই, আর যদি ঋণ করে' মূলধন সংগ্রহ করতে হয়, ত টাকার বাজারে আমাদের প্রসার প্রতিপত্তি যাতে বাড়ে তা' করতে হবে। বিদেশী মূলধনের অভাব পূরণ করবার একটা কথা উঠেছে।

সে বিষয়ের ঔচিত্য-অনৌচিত্য নির্দ্ধারণ করবার জন্য একটা কমিটিও নিযুক্ত হয়েছে। অতএব এই বেকার সমস্যা সম্বন্ধে কিছু করবার আগে সেই কমিটির রিপোর্টের অপেক্ষা করা উচিত।

পঞ্জাবের সরকারী সদস্য মিঃ কালভার্ট বুঝেছেন যে এই প্রস্তাবিত কমিটি নিয়োগের উদ্দেশ্য হচ্ছে বড় বড় সরকারী কাজে যাতে আমাদের শিক্ষিত যুবকদের সহজে প্রবেশলাভ হয়, তারই একটা উপায় উদ্ভাবন করা। তিনি বলেন, সমস্যাটা আর্থিক। তিনি হিসাব করে' দেখেছেন যে এক কোটি টাকার মূলধন ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটালে পাঁচ শ' লোককে বড় চাকরি দেওয়া যায়। এদেশে যে টাকার অভাব নেই তার প্রমাণ এই যে পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে ২৭ কোটি টাকা জমা আছে। আর গত চল্লিশ বছরে ৪৮৪ কোটি টাকার সোনা এদেশে এসেছে। দেশের সমস্ত যৌথ কারবারের মূলধন একত্র করলে হয় ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মূলধন খাটাচ্ছেন ৬০০ কোটি টাকা। তিনি আরও বলেন, ছোট ছোট শ্রমশিল্পের কাজ এদেশে অনেক হতে পারে। কিন্তু তাতে মূলধন না খাটিয়ে দেশের লোক চায় অন্য লোকে মূলধন দিয়ে কারবার করুক আর তারা তাতে বড় বড় চাকরি করুক। গো-পালন এবং দুধ-ঘিয়ের ব্যবসা, ময়দার কল এদেশে অনেক হচ্ছে, কিন্তু কলেজের ছেলেরা তাতে কাজ করে না। এ সকল ছাড়া, তিনি বলেন, আর একটা উপায় আছে। সেটা হচ্ছে কৃষির উন্নতি করা। কৃষিকার্য্যের উন্নতির দ্বারা কাঁচা মাল উৎপাদন করে' কৃষকের ধনবৃদ্ধি হবে এবং সেই ধন দিয়ে সেই কাঁচা মাল থেকে যে শিল্পজাত দ্রব্য হয় কৃষক তাই

কিনবে। চাই মূলধন, উদ্যম, বিশ্বাস এবং পরিশ্রম। কিন্তু, মিঃ কালভার্ট বলেন, সে-সব কাজ অন্য লোকের, গবর্ণমেণ্টের নয়। যদি বিদেশী মূলধন এদেশে খাটান যায়, তা হ'লে ভারতীয় শিক্ষিত যুবকেরা অনেক কাজ পেতে পারে।

এ থেকে বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ইংরেজ কোম্পানী এবং তখনকার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতশাসন-গীতের যে সুর বেঁধে দিয়েছেন, মিঃ কালভার্টের গীত সেই সুরের একতানতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেই চলেছে। সে সুরটি এই যে ভারতবর্ষ কাঁচা মাল (raw materials) উৎপাদন করুক আর সেই উৎপন্ন কাঁচা মাল বিলেতে গিয়ে বিলিতি অকর্ম্মাদের কাজ জুগিয়ে দিয়ে শিল্পজাত পণ্যে পরিণত হয়ে আবার এদেশে বিক্রী হ'ক। কিন্তু বিলেতে কারখানা আইনের পরিবর্ত্তন, শ্রমজীবীদের মধ্যে বলশেভিক নীতির প্রাদুর্ভাব, তাদের ধর্ম্মঘটের উৎপাত, অবাধ বাণিজ্য-নীতির পরিবর্ত্তন, এদেশে টারিফ বোর্ডের কোনো কোনো শ্রমশিল্পের রক্ষণ চেষ্টা প্রভৃতি নানা কারণে এখন এদেশের কাঁচা মাল সে-দেশে রপ্তানি করার চেয়ে সে-দেশের মূলধন এদেশে আমদানী করে' এনে' এই দেশেই কাঁচা মালকে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করা সহজ বলে' বিলেতের মূলধনীরা মনে করেছেন। সেইজন্য সে পুরোণো সুরের একতানতা বজায় রেখে আর এক গ্রাম চড়াবার কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মিঃ কালভার্টের বক্তৃতার সুরেও তারই আভাষ।

লালা লাজপত রায় মিঃ কালভার্টের দু' একটি কথার বেশ উত্তর দিয়েছেন। লালাজী বলেন, দেশের শিক্ষিত যুবকেরা যদি ছোট-

ছোট শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত হয়, তা হ'লে গ্রামে যারা ঐ কাজ করে' জীবন ধারণ করছে তাদের অন্ন মারা যাবে। মিঃ কালভার্টের সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার যুক্তি সম্বন্ধে লালাজী বলেন, মিঃ কালভার্টের এখনও উপলব্ধি হয়নি যে ভারত গবর্ণমেণ্টের যে টাকাটা ব্যাঙ্কের বাকী খাতে জমা থাকে সে টাকাটা বিদেশী বণিকদেরই উপকারার্থে ব্যয় করা হয়, দেশের ছোট ছোট শ্রমশিল্প-বাণিজ্যের সাহায্যে তা' ব্যয় করা হয় না। পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কের ২৭ কোটি টাকাও ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কে গিয়ে ঐরূপ পরিণতি লাভ করে। লালাজী আরও গবর্ণমেণ্টকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা এবং দেশের মধ্যে আইন ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা করাই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের শেষ নয়। দেশের লোকের অন্নকষ্ট নিবারণ করাও গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

মিঃ যোশীও মিঃ সিদ্দিকের মত দেশের সকল লোকেরই কর্ম্ম-হীনতা যাতে দূর হয় প্রস্তাবিত কমিটিকে তাই করতে বলেন। তিনি এজন্য বীমার ব্যবস্থা (unemployment insurance) করতে বলেন।

এই সকল তর্কবিতর্কের পর স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, শিল্পবাণিজ্য সচিব, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে বলেন—ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব পূরণের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি যা' দিতেন, তা' আর এখন তাঁদেকে দিতে হয় না, ভারত গবর্ণমেণ্ট সেটা এখন তাঁদেকে ছেড়ে দিয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এমন অনেক কাজ করতে পারেন যাতে কর্ম্মহীনদের অনেকের কর্ম্মের সংস্থান হতে পারে। তারপর কৃষির উন্নতির জন্য রাজকীয় কৃষিকমিশন বসেছেন, তাঁরাও

শিক্ষিত বেকারদের জন্য কিছু করতে পারেন। এখন প্রাদেশিক জননায়কদের কর্ত্তব্য এমন কোনো উপায় উদ্ভাবন করা যাতে শিক্ষিত-দের মধ্যে বেকার-সমস্যাটার সমাধান হয়। এই ত গেল শিক্ষিতদের মধ্যে কর্ম্মহীনতার কথা। অশিক্ষিতদের মধ্যে কর্ম্মহীনতা সম্বন্ধে স্যর ভূপেন্দ্রনাথ বলেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ আছে। যদি তাঁরা মনে করেন ভারত গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবার সময় হয়েছে, তা হ'লে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে প্রস্তুত হবেন। কিন্তু এখন ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য কমিটি নিযুক্ত করতে পারেন না। কারণ, এখন কোনো কমিটি নিযুক্ত করলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হতে পারেন; তাঁরা হয়ত কিছু করবার ইচ্ছা করেছেন, তাতে ব্যাঘাত জন্মাতে পারে। স্যর ভূপেন্দ্রনাথ এই সকল যুক্তি দেখিয়ে শেষে বলেন, যদি এই সকল কারণ সত্ত্বেও এই পরিষৎ এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন, তা হ'লে ভারত গবর্ণমেণ্ট এখন কেবল এ বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

স্যর ভূপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি এ বিষয়ে অমনোযোগী নন। তার কারণ বোধ হয় এই যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে এ বিষয়ের আলোচনা হবার বহুপূর্ব্বে—৩০শে মার্চ্চ ১৯২২—পরলোকগত রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে বেকার সমস্যার কথা বাঙলা কৌন্সিলে উত্থাপন করেছিলেন। তিনিও প্রস্তাব করেছিলেন যে, একটা কমিটি নিযুক্ত করে' এর কারণ কি এবং প্রতিকার কি তার তদন্ত করা হ'ক। তাঁর প্রস্তাবটি সামান্য পরিবর্ত্তিত করে' কৌন্সিল গ্রহণ করেছিলেন এবং একটি কমিটিও নিযুক্ত করেছিলেন। কমিটিতে ছিলেন স্বয়ং রাধাচরণ পাল, শ্রমশিল্পবিভাগের ডাইরেক্টার ডাক্তার মীক, কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টার মিঃ ফিনলো, শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার এবং আরও কয়েকজন বাঙলা কৌন্সিলের সদস্য। এই সময়ে ফিরিঙ্গী সমাজেও এই সমস্যার আন্দোলন হয়। গবর্ণমেণ্ট এই কমিটিকে তাদের সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করতে বলেন এবং ফিরিঙ্গীদের মধ্যে কয়েকজন নেতাকে সদস্য নিযুক্ত করেন। কমিটি নিযুক্ত হবার কিছুদিন পরেই রাধাচরণ পালের মৃত্যু হয়। তাঁর স্থানে নিযুক্ত হন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী। তিনিও বাঙলা কৌন্সিলের সদস্য।

কমিটি অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়েছেন। একজন ইউরোপীয় সাক্ষী বলেন, বাঙলা দেশে যে কর্ম্মহীনতা আছে, তা তিনি বিশ্বাসই করেন না। তিনি বলেন নিষ্কর্ম্মা লোক বাঙলায় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তারা যে-কর্ম্মে শারীরিক পরিশ্রম আছে তা' করতে চায় না; তারা শ্রমজীবী হতে চায় না; শ্রমজীবী-শ্রেণীভুক্ত হলে, তারা মনে করে, তাদের সামাজিক মর্য্যাদার হানি হবে। তারা মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত লোক, সমাজে মধ্য শ্রেণীর যে মর্য্যাদা আছে তা' অক্ষুণ্ণ রেখে যে-কর্ম্মের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা যেতে পারে সে রকম কর্ম্ম পেলে তারা করতে পারে, অন্য কর্ম্ম তারা করতে চায় না। এই সাক্ষী আরও বলেন যে বাঙালীদের বর্ত্তমান সামাজিক প্রথা অনুসারে তাদের সেই অভিমান বজায় রেখে তারা এ পর্য্যন্ত চলতেও পেরেছে। তারা যে শ্রমজীবী হতে চায় না, তার প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন যে কাকিনাড়া অঞ্চলে যে সকল পাটের কল আছে, তাতে যত লোক কাজ করে তার মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা ত্রিশ জনের মধ্যে এক জন। এই সাক্ষীর মতে বাঙলার কৃষিসম্পদে এখনও বেশ সচ্ছলতা আছে। যদি কখনও এই সচ্ছলতা নষ্ট হয়, তখন এই শ্রেণীর লোকের উদ্যম বাড়বে, তখন সব কাজ করতেই তারা প্রস্তুত হবে। তিনি আরও বলেন যে ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ তিনি দেখেন নি যেখানে সমাজের অধিকাংশ লোক কোনো কাজ না করে' মধ্যম রকমের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

এই সাক্ষীর কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য না হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে প্রণিধানযোগ্য অনেক কথা আছে। প্রধান কথাটা এই যে, বেকার, কর্ম্মহীন বা unemployed বলতে আমরা সাধারণতঃ কি

বুঝি? বোঝা উচিত, যাদের কর্ম্ম ছিল কিন্তু এখন নেই, অথবা যারা কোনো বিশেষ কর্ম্ম করবে বলে' সেই কর্ম্মের জন্য শিক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত হবার পরে কর্ম্ম পাচ্ছে না। কিন্তু বস্তুতঃ আমরা বুঝি এই যে, যারা সাধারণ শিক্ষা পেয়ে অর্থাৎ কোনো বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষা না পেয়ে, দশকর্ম্মান্বিত হয়েছে মনে করে' সকল কাজেরই প্রার্থী হয় কিন্তু কোনো কাজ পায় না তারাই বেকার, কর্ম্মহীন বা unemployed. এইরূপ কর্ম্মহীনকে কর্ম্ম দেবার জন্যই প্রধানতঃ এই বেকার সমস্যা উঠেছে। আর সেইজন্যই এই ইউরোপীয় সাক্ষীটি বলেছেন যে এদেশে প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মহীনতা (unemployment) নেই। আর এইজন্যই বোধহয় স্যর টমাস হোল্ডারনেস্ (Sir Thomas Holderness), ভারত-সচিবের ভূতপূর্ব্ব আণ্ডার সেক্রেটারী, These Eventful Years নামক পুস্তকে বলেছেন যে ব্রিটিশশাসনে ভারতবর্ষে কর্ম্মহীনতা নেই। কারণ, কর্ম্মহীনতা সম্বন্ধে এদেশের সরকারী এবং বেসরকারী সকল ইউরোপীয়েরই ধারণা এই যে, কল-কারখানায়, খনিতে, এবং অন্যান্য শ্রমশিল্পে যে সকল লোক নিযুক্ত আছে, উৎপন্ন দ্রব্যের বাহুল্যে তাদের কর্ম্ম যাওয়া; এবং যারা এই সকল কর্ম্মের জন্য শিক্ষিত হচ্ছে, তাদের উপযুক্ত কর্ম্ম না-পাওয়া। ইউরোপের সকল দেশেই এখন এইরূপ কর্ম্মহীনতা উপস্থিত হয়েছে। তাই আজ ইউরোপের সর্ব্বদেশীয় লোক আন্তর্জ্জাতিক সমিতিতে সম্মিলিত হয়ে সকল দেশের শ্রমজীবীকে সংঘবদ্ধ হতে আহ্বান করছে, বলছে "Proletarians of all countries, unite." এদেশের কল-কারখানায়ও কখনো কখনো ধর্ম্মঘট হয় এবং তার জন্য শ্রমজীবীরা কর্ম্মহীন হয়, কিন্তু সে অবস্থা

দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আর, দেশের অধিবাসীসংখ্যার তুলনায় সংখ্যায়ও এইরূপ কর্ম্মহীন নগণ্য। যারা সবিশেষ গণ্য, যারা কখনো ধর্ম্মঘট করে না, সেই কৃষিজীবীরা জাতিসংঘের (League of nations) বিবেচনায় শ্রমজীবী নয়। কাজেই সরকারী বেসরকারী সকল ইউরোপীয়ের মতে এদেশে কর্ম্মহীনতা বা unemployment নেই। কেবল ইউরোপীয় নয়, যে সকল উচ্চ ভারতবর্ষীয় রাজ-পুরুষ ইউরোপীয় রাজপুরুষদের সামীপ্য লাভ করে' তাঁদেরই মনো-ভাবে ভাবান্বিত হয়েছেন, তাঁরাও বলেন, দেশে কর্ম্মহীনতা নেই, অন্ততঃ এমন তীব্রভাবে নেই যাতে গবর্ণমেণ্টকে এর জন্য চিন্তিত হতে হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চিন্তার আর একটা কারণ আছে। দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকেরা কোনো কর্ম্ম না পেয়ে তাদের অলস মনে শয়তানের কর্ম্মশালা স্থাপন করেছে এবং সেই কর্ম্মশালায় অশান্তির অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মিত হচ্ছে। গবর্ণমেণ্ট একথা প্রকাশ করে' বলেছেনও অনেকবার।

উল্লিখিত ইউরোপীয় সাক্ষীটি, পাটের কলে যারা কাজ করে, তাদের যে উদাহরণ দিয়েছেন তার মধ্যেও কিছু সত্য যে নেই তা নয়। সেন্সাস রিপোর্ট সে সম্বন্ধে বলে—কলগুলি সম্পূর্ণভাবে ইউ-রোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ তার বড় বড় কর্ম্মগুলি সব ইউরোপীয়দের; ইতর কর্ম্মগুলিতে দেশীয় লোক আছে, তাদের মধ্যে মুসলমানই প্রধান; হিন্দুদের মধ্যে কৈবর্ত্ত এবং মুচি আছে; তারা কলের কাজ করে, চটও বোনে; যারা নিপুণ (skilled) কর্ম্মী তাদের এক-চতুর্থাংশ মাত্র বাঙলাদেশজাত, বাকী তিন-চতুর্থাংশ বাঙলার বাইরের লোক।

কিন্তু সকল সাক্ষী অবশ্য এই ইউরোপীয় সাক্ষীটির মত নয়। কমিটি সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাঙলা দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে কর্ম্মহীনতা আছে এবং তার প্রতীকারের চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। কমিটির মতে এই কর্ম্মহীনতার কারণ,—(১) দেশের লোকের সাধারণ জীবন-যাত্রার মানবৃদ্ধি (rise in the standard of living); (২) জীবন-যাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি (rise in the cost of living); (৩) মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভদ্রলোকের মধ্যে এখন 'ইতর' শ্রেণীর লোকের প্রবেশজনিত ভদ্রশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি ; (৪) দেশীয় শ্রমশিল্পের ধ্বংস।

সেকালে—প্রাচীন যুগে নয়, এই চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে—মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা গ্রামে বাস করতেন ; সকলেরই জমিজমা ছিল এবং তার আয় থেকেই সংসার চলত। এই আয়টা প্রায় স্থির ছিল, তাতে হ্রাসবৃদ্ধি খুব কমই হত। কিন্তু এর মধ্যে ব্যয় বেড়ে গেল। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব সহর থেকে পল্লীগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হল ; বণিকের চর-অনুচরেরা গ্রামে গ্রামে বাণিজ্যের পণ্য কিনতে লাগল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক বিলাসের সামগ্রীও গ্রামে গ্রামে বিক্রী হতে লাগল। সহরে কর্ম্মোপলক্ষে যাঁরা বিদেশী রাজপুরুষ এবং বিদেশী বণিকদের সংস্রবে এলেন, তাঁরা তাঁদের কাছে নতুন 'সভ্যতা' শিখলেন এবং যিনি যে পরিমাণে সেই 'সভ্যতা' আত্মসাৎ করতে পারলেন তিনি সেই পরিমাণে তাঁদের কাছে সমাদর লাভ করলেন। এঁরা আবার সহর থেকে গ্রামে এসে সেই সভ্যতাব্যাধি সংক্রামিত করতে লাগলেন। এইরূপে পল্লী-গ্রামের সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য মহার্ঘ হয়ে উঠল, আর তার উপর

চাকচিক্যময় মনোহর বিলাসের সামগ্রী সুলভ হল এবং এই দুয়ের সমাবেশে সংসারযাত্রানির্ব্বাহের ব্যয় খুব বেড়ে গেল। আয় কিন্তু তেমন বাড়ল না। পল্লীগ্রামে জমিজমার উৎপন্ন ফসলের দ্বারাই হ'ক আর তার খাজনার দ্বারাই হ'ক, আয় বাড়ান সহজ নয়। কাজেই ব্যয়বৃদ্ধির অনুপাতে আয়বৃদ্ধির চেষ্টায় ভদ্রলোককে পল্লীগ্রাম ছেড়ে সহরে যেতে হল। একান্নবর্ত্তী পরিবার ভেঙে ছিন্নভিন্ন হল; তার আশ্রয় গেল, সাহায্য গেল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বহু গ্রাম ভদ্রলোকশূন্য হয়ে গেল। এদিকে সহরে বাস এবং নতুন 'সভ্যতা'র জন্য ব্যয়ও অনেক বেড়ে গেল।

এই সময়ে দেশে ইংরেজী শিক্ষাও প্রচলিত হল। দেশের লোকের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাবিস্তার রাজার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে; কিন্তু বণিকরাজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ বিষয়েও ব্যবসায়-বুদ্ধির প্রয়োগ করেছিলেন। রাজশক্তি ব্যবসায়-বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত হলে যা হয় এ স্থলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ইংরেজ কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তার ক্ষতি-বৃদ্ধির কথাটা বিশেষ করে' বিবেচনা করলেন। ইংরেজী সাহিত্য-বিজ্ঞান দেশের লোকের ধার্ম্মিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, সব রকম কুসংস্কার দূর করে' দিয়ে, হিন্দু-মুসলমানের এবং হিন্দুর মধ্যে বিভিন্ন জাতির, ভেদ উঠিয়ে দিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করলে পরিণামে ইংরেজ-রাজত্বের স্থায়িত্বসম্বন্ধে কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হবে কি না, সে সকল কথাও তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন। Sir Charles Trevelyan ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে Parliamentary Committeeর কাছে "The political tendency of the different systems of education in use in India"—বিষয়ক একটা মন্তব্য উপস্থিত করেছিলেন। তাতে মুসলমানী শিক্ষানীতিসম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন,—

"The Arabian or Mahomedan system is based upon

the exercise of power and the indulgence of passions. Pride, ambition, the love of rule and of sensual enjoyment are called in to the aid of religion. The earth is the inheritance of the Faithful ; all besides are infidel usurpers with whom no measures are to be kept, except what policy may require. Universal dominion belongs to Mahomedans by Divine right. Their religion obliges them to establish their predominance by the sword,........."

হিন্দুশিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে Sir Charles বলেন,—

"The Hindu system, although less fierce and aggressive than the Mahomedan, is still more exclusive : all who are not Hindoos are impure outcastes......utterly disqualified for the duties of Government......But what will be thought of that plan of national education which would revive them and make them popular, would be perpetually reminding the Mahomedans that we are infidel usurpers of some of the fairest realms of the Faithful, and the Hindoos that we are unclean beasts with whom it is a sin and a shame to have any friendly intercourse ?"

আর ইংরেজীশিক্ষা প্রচলিত হলে যা' হবে তা'ও বলেছিলেন,—

"Familiarly acquainted with us by means of our literature, the Indian youth almost cease to regard us as foreigners. They speak of our great men with the same enthusiasm as we do. Educated in the same way, interested in the same objects, engaged in the same pursuits with ourselves, they become more English than Hindoos."

লর্ড মেকলে এই ভাবটি আরও স্পষ্ট করে' এবং সুন্দর করে' বলেছেন,—

"We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern ; *a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, words and intellect.*"

কোনো বিজেতৃজাতিই কেবলমাত্র দেশের বহিঃপ্রকৃতি জয় করে' নিশ্চিন্ত হতে পারেনি ; বিজিত দেশের লোকের আভ্যন্তরিক প্রকৃতিও জয় করবার চেষ্টা করেছে, এবং যে জাতি যে পরিমাণে সেই চেষ্টাদ্বারা বিজিত জাতির মধ্যে দাস-মনোভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে, সেই জাতি সেই পরিমাণে বিজিত জাতির উপর রাজত্ব স্থায়ী করতে পেরেছে। আর, এ কাজের প্রধান উপায় বিজেতার সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, এক কথায় Culture বা 'সভ্যতা'। Sir Charles Trevelyan এই মতের সমর্থনে তাঁর পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যে বলেছেন,—

"In following the course we should be trying no new experiment. The Romans at once civilised the nations of Europe and attached them to their rule by Romanising them ; or in other words, by educating them in Roman literature and arts and teaching them to emulate their conquerors instead of opposing them......The Indians will, I hope, soon stand in the same position towards us in which we once stood towards the Romans......it was the policy of Julius Agricola to instruct the sons of the leading men among the Britons in the literature and science of Rome and to give them a taste for the refinements of Roman civilization. We all know how well this plan answered."

এইরূপ উচ্চ অঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক কথা আরও অনেক উদ্ধৃত করা যেতে পারে, কিন্তু সে আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ইংরেজী শিক্ষায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থার কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাই আমাদের আলোচ্য। পূর্ব্বেই বলেছি ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রধান উদ্দেশ্য দেশের লোককে ইংরেজীরূপে সভ্য করা। ।ভ্যতা কেবল একটা মানসিক ব্যাপার নয়, এর একটা বহিরঙ্গও আছে। পোষাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা এবং তার আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র ও অন্য অন্য সুলভ অথচ সুন্দর উপকরণ—এ সকলও সভ্যতার অঙ্গ। সুতরাং সভ্যতাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এ সকলের ব্যবহার শিক্ষাও দেওয়া হল। একটা নতুন অভাবের সৃষ্টি করা হল, এবং তার পূরণের জন্য ইংরেজ বণিক আবশ্যকীয় জিনিষপত্রও সরবরাহ করলেন। নতুন-সভ্যতা-মুগ্ধ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকও এই সকল জিনিষপত্রের যথেষ্ট ব্যবহার করতে লাগলেন। শিক্ষার ভিতর দিয়ে ইংরেজের ব্যবসায়বুদ্ধি আশার অতিরিক্ত ফল লাভ করলে। Sir Charles Trevelyan তাঁর মন্তব্যে স্পষ্টই বলেছিলেন যে এই শিক্ষা

"would secure to us a larger and more certain supply for our manufactures and extensively consumed by all classes of our population as well as inexhaustible demand for the produce of British labour."

এবং এর সমর্থনের জন্য জুলিয়াস এগ্রিকোলার নীতি উদ্ধৃত করেছিলেন

"to give them a taste for the refinements of Roman civilization."

তারপরে কথাটা আরও স্পষ্ট করে' বলেছিলেন মেকলে—

"We must do our best to form a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, words and intellect,"

তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হল। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যাঁর যতদূর ক্ষমতা, অনেক স্থলে ক্ষমতার অতিরিক্ত, 'সাহেব' হলেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রচলনের সময় এই সাহেবিয়ানার দৌরাত্ম্য কতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল তা সকলেই জানেন। এখনও তার প্রাদুর্ভাব বড় কম নয়। বেকার সমস্যায়, পূর্ব্বেই বলেছি, এর প্রাসঙ্গিকতা এই যে, এতে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সংসারযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেল অত্যন্ত অধিক।

ইংরেজী-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানী-প্রতিষ্ঠিত এবং কোম্পানীর সাহায্যে দেশের লোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজে কোম্পানীর উচ্চনীচ সকল রকমের চাকরির (service) জন্য লোক প্রস্তুত করা, যার জন্য পরবর্ত্তী কালে লোকে এই বিদ্যালয়গুলির কেন্দ্রস্থানকে 'গোলামখানা' বলে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তখনকার গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ শিক্ষা সম্বন্ধে যে মিনিট লেখেন তাতে তিনি বলেন,—

"The Governor-General, having taken into consideration the existing state of education in Bengal, and being of opinion that it is highly desirable to afford it every reasonable encouragement by holding out to those who have taken advantage of the opportunity of instruction, a fair prospect of employment in the public service and thereby not only to reward individual merit but to enable the state to profit as largely as possible by the result

of the measures adopted of late years for the instruction of the people as well by the Government as by private individuals and societies, has resolved that in every possible case a preference shall be given in the selection of candidates for public employment to those who have been educated in institutions thus established and especially to those who have distinguished themselves therein by a more than ordinary degree of merit."

তার পরে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অভ্ ডিরেক্টারস্ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেলকে এই বিষয়ে এক পত্র লেখেন। তাতেও তাঁরা বলেন,—

"We have, moreover, always looked upon the encouragement of education as precisely important, because calculated not only to produce a higher degree of intellectual fitness, but to raise the moral character of those who partake of its advantages and so to supply you with servants to whose probity you may with increased confidence commit offices of trust etc."

আরও—

"We have always been of opinion that the spread of education in India will produce a greater efficiency in all branches of administration by enabling you to obtain the services of intelligent and trustworthy persons in every department of Government."

তারপরেই—

"And we understand that it is often not so much the want of Government employment as the want of

properly qualified persons to be employed by Government, which is felt, at the present time, in many parts of India." এই উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের অভাব, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টও বলেন, এখনও আছে এবং সেইজন্য এখনও উচ্চশ্রেণীর রাজকার্য্যের জন্য বিলেত থেকে উপযুক্ত শিক্ষিত লোক আমদানী করতে হয়, এবং এদেশের লোককে শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য বিলেতে পাঠাতে হয়।

এই বিলেতে গিয়ে শিক্ষালাভ করার মূলে আছে একটা গুরুতর রাজনৈতিক হেতু, অন্ততঃ তখনকার দিনে ছিল। কোম্পানীর মাতব্বরদের মধ্যে এক শ্রেণীর মত ছিল এই যে, ইংরেজী শিক্ষাদ্বারা ভারতবর্ষের লোকের স্বাধীনতাস্পৃহা জাগরিত হবে এবং ইংরেজের রাজত্ব বিপন্ন হবে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন মিঃ জে, সি, মার্শম্যান লর্ড-সভায় যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হবার অনেক দিন পর ভারতবাসীকে কোনো প্রকার শিক্ষা দেবার কথা উঠলেই নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করা হত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে যখন কোম্পানীর পাট্টা বদলান হয় তখন দু'জন শিক্ষক ভারতবর্ষে পাঠাবার জন্য মিঃ উইলবার-ফোর্স সেই পাট্টায় (Charter Act of 1792) দুটি ধারা যোগ করে' দেবার প্রস্তাব করেন; কোর্ট অভ্ ডিরেক্টারস্ তাতে মহা আপত্তি করেন; ফলে, মিঃ উইলবারফোর্সকে সে প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে হয়। সেই উপলক্ষ্যে যে তর্কবিতর্ক হয় তাতে একজন ডিরেক্টার বলেছিলেন, আমরা নির্ব্বুদ্ধিতা করে' আমেরিকায় স্কুল-কলেজ স্থাপন করতে দিয়েছিলাম, তার ফলে আমরা আমেরিকা হারিয়েছি; ভারতবর্ষে আবার সেইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা

করলে চলবে না; 'নেটিভ'রা শিক্ষা বলে' যদি কিছু পেতে চায় তা হ'লে তাদেকে ইংলণ্ডে আসতে হবে,—

"One of the Directors stated that we had just lost America from our folly in having allowed the establishment of Schools and Colleges, and that it would not do for us to repeat the same act of folly in regard to India; and that if the natives required anything in the way of education, they must come to England for it." *

এই ডিরেক্টারটির মত বুদ্ধিমান ইংরেজ কিন্তু আমেরিকা রক্ষা করবার জন্য যাতে আমেরিকায় বিদ্যার আলো না প্রবেশ করে তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন; আইন করেছিলেন যে, লিখতে বা পড়তে শেখবার জন্য নিগ্রোরা যদি একত্র সমবেত হয়, তা হ'লে সেটা অবৈধ জনতা হবে; যেখানে এইরূপ জনতা হবে সেখানে প্রবেশ করে' এইরূপ নিগ্রোকে ধরে' আনবার জন্য যে-কোনো-ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট জারি করতে পারবেন; এবং ধৃত হয়ে এলে ম্যাজিষ্ট্রেট সেই নিগ্রোকে বেত-মারার সাজা দিতে পারবেন, যদি কোনো শ্বেতাঙ্গ নিগ্রোদেকে লিখতে বা পড়তে শেখাবার জন্য তাদের জনতায় উপস্থিত থাকে, তা হ'লে সেই শ্বেতাঙ্গের সাজা হবে ছ' মাসের অনধিক জেল অথবা এক শ' ডলারের অনধিক জরিমনা—

"Every Assembly of Negroes for the purpose of instruction in reading or writing shall be an unlawful assembly. Any Justice may issue his warrant to any officer or other person requiring him to enter any place

* Quoted in Education in India under the East India Company by Major B. D. Basu, p. 4.

where such assembly may be and seize any negro therein; and he or any other Justice may order such negro to be punished with stripes. Again, if a white man assemble with such negro for the purpose of instructing them to read or write, he shall be confined to jail not exceeding six months and fined not exceeding one hundred dollars." *

দক্ষিণ কেরোলিনাতেও ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এইরূপ আইন করা হয়েছিল—যদি কোনো ব্যক্তি কোনো দাসকে লেখাপড়া শেখায় বা শেখাবার চেষ্টা করে বা সাহায্য করে, তা হ'লে ঐ ব্যক্তি শ্বেতাঙ্গ হলে তার এক শ' ডলার পর্য্যন্ত জরিমানা এবং ছ' মাসের অনধিক জেল হবে; আর যদি ঐ ব্যক্তি সবর্ণ (person of colour) হয় তা হ'লে তার পঞ্চাশ ঘা'র অনধিক বেত এবং পঞ্চাশ ডলারের অনধিক জরিমানা হবে; আর যদি সে ব্যক্তি দাস হয়, তা হ'লে তার পঞ্চাশ ঘা'র অনধিক বেত হবে। জর্জ্জিয়া এবং আলাবামা ষ্টেটেও এইরূপ আইন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সভ্যতাভিমানী খৃষ্টিয়ান ইংরেজের এই ব্যবহার!

নিগ্রোর প্রতি মানুষের মত ব্যবহার তাঁদের মতে অশাস্ত্রীয়, সুতরাং অনাবশ্যক। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাতব্বরদের মধ্যেও এমন লোক ছিল যারা ভারতবর্ষের 'নেটিভ'দেকে, ঠিক নিগ্রো না হ'ক, ঐরূপই এক প্রকার জীব মনে করত। তাই ভারতীয় 'নেটিভে'র বিদ্যাস্থানকে একবারে অবৈধ জনতার স্থান বলে' অগম্য না করে', সেটাকে যথাসম্ভব দুর্গম করে' দিয়েছেন। তার ফলে

* Code of Virginia quoted in Education in India by Major B. D. Basu, p. 3.

ভদ্রলোকেরা ইংরেজী শিক্ষালাভের এক রকম সুবিধা পেল বটে, কিন্তু জনসাধারণ তা' থেকে বঞ্চিত থাকল। কোম্পানীর উদ্দেশ্যই ছিল তাই। মিঃ ফ্রেজার নামে একটি সদাশয় ইংরেজ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৮০টি কৃষকবালকের জন্য স্কুল করেছিলেন। এর ব্যয়ভার, মাসিক দু'শ টাকা, তিনি নিজেই বহন করতেন। স্কুলটি চার শ' ছেলে পড়বার মত বড় করে' তিনি গবর্ণমেণ্টের হাতে দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-কমিটি বললেন গ্রাম্য পাঠশালার জন্য ব্যয় করবার মত টাকা তাঁদের নেই, যে-টাকা তাঁদের হাতে আছে তা' উচ্চতর শ্রেণীর লোকের শিক্ষার জন্যই ব্যয় করা উচিত।

"......The limited funds under the committee's management ought in preference to be employed in giving a liberal education to the 'higher classes' of the community." *

গবর্ণমেণ্ট যথারীতি একথা কোর্ট অভ্ ডিরেক্টারস্‌কে জানালেন। কোর্ট অভ্ ডিরেক্টারস্ প্রত্যুত্তরে বাঙলার গবর্ণর-জেনারেলকে উপদেশ দিলেন যে, যখন শিক্ষার জন্য ব্যয় করবার টাকা অল্প, তখন প্রধান প্রধান স্থানে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর লোকের শিক্ষার জন্যই তা' ব্যয় করা উচিত কারণ, উচ্চ ও মধ্য শ্রেণী থেকেই গবর্ণমেণ্টের চাকরির জন্য লোক সংগ্রহ করা হয় এবং অন্য অন্য শ্রেণীর লোকের উপর তাদের খুব প্রভাব আছে—

"From the imited nature of the means at your

* Report of Select Committee on the Affairs of the East India Company, p. 409

disposal, you can only engage in very limited undertakings; and where a preference must be made there can be no doubt of the utility of commencing both at the places of the greatest importance, and with the 'superior and middle classes' of the natives from whom the native agents whom you have occasion to employ in the functions of Government are most fitly drawn, and whose influence on the rest of their countrymen is the most extensive. *

এইরূপে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর লোকের শিক্ষার সূত্রপাত হল, মুখ্যতঃ সরকারী চাকরির জন্য এবং ইংরেজী সভ্যতার বিস্তার ও তার দ্বারা ইংরেজের শিল্পবাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির জন্য; গৌণতঃ, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্য-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য। তথাকথিত 'ইতর' শ্রেণীর লোকের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই হল না। তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রইল। উভয় শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমে সুদূরবিস্তৃত হল, উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর লোকেরা 'ইতর' শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যেন একটা নতুন শিক্ষার আভিজাত্য লাভ করলেন। তাঁদের পরবংশীয়েরা আরও একটু উন্নতি লাভ করলেন, পল্লীগ্রামে বাস এবং ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার অভাবকে তাঁরা একটু ঘৃণার চক্ষে দেখতে লাগলেন এবং নিজেদের শিক্ষিত, সভ্য, নাগর বলে' একটু গর্ব্ব অনুভব করতে লাগলেন। সরকারী এবং সওদাগরী অফিসে নানাবিধ কেরাণীর কাজও অনেকে পেতে লাগলেন। কিন্তু ক্রমেই অফিসের চাহিদার চেয়ে স্কুল-কলেজের যোগান বেশী হয়ে উঠল, কেরাণীগিরি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল। একথা যে আজ আমরাই বলছি তা'

* Report of Select Committee on the Affairs of the East India Company, p. 490.

নয়, ৭২ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের Calcutta Reviewএ "the rush for keraniships with their deadening effect and the want of 'practical education' "-এর অভিযোগ দেখতে পাওয়া যায়। এখন কেবল সেই ভাবটা আরও ঘনীভূত হয়েছে।

১৯

ইংরেজী শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্যও আংশিকভাবে সফল হতে লাগল। ইংরেজী সাহিত্য-বিজ্ঞান দেশের লোকের মনে জ্ঞানের স্পৃহার সঙ্গে রাজকার্য্যে উচ্চ পদ এবং ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়ে তুললে। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তকেরা সে আশঙ্কাও করেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন, তাঁর সেক্রেটারি মিঃ থ্যাকারে (Mr. Thackeray) তাঁর একটা রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, ইংলণ্ডে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত পরিবারকে পৃথিবীর ধনসম্পদ দিয়ে রক্ষা করা উচিত, কারণ, সেই সকল বংশে দেশরক্ষার জন্য বীর এবং রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য মন্ত্রণা-সভার সদস্য জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু ধনসম্পত্তির অধিকারে যে স্বাধীনতার ঔদ্ধত্য এবং গভীর চিন্তাশীলতার সম্ভব হয়, ভারতবর্ষে তা' দমন করে' রাখাই উচিত; ভারতবর্ষের লোক সেনাপতি হবে, কি রাজনীতিবিশারদ হবে, কি ব্যবস্থাপক হবে, ইংরেজ তা' চায় না, ইংরেজ চায় কেবল শ্রমশীল কর্ম্মী—

"it is very proper that, in England, a good share of the produce of the earth should be appropriated to support certain families in affluence, to produce senators, sages and

heroes for the service and defence of the state............ but in India, that haughty spirit of independence and deep thought which the possession of wealth sometimes gives, ought to be suppressed. We do not want generals, statesmen and legislators: we want industrious husbandmen." *

বেকার সমস্যার বিচারে এর মধ্যে সবিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ইংরেজী সাহিত্য-বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যলাভ করলেও যাতে ধন আছে, মান আছে, ক্ষমতা আছে, এমন কাজ ভারতবাসীকে দেওয়া ইংরেজের নীতিবিরুদ্ধ। এখন সে নীতির কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন বাইরের আকৃতির, ভিতরের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বড় কিছু দেখা যায় না। এখনও রাজকার্য্যের কতকগুলিতে ভারতবর্ষীয় লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কতকগুলিতে একেবারে নিষিদ্ধ না হলেও অত্যন্ত দুরূহ, আর সকলগুলিতেই ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট অংশ আছে; সিংহের অংশ ইংরেজের, আর একটা সামান্য ভগ্নাংশ ভারতবর্ষীয়ের। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তি তার অনুবর্ত্তন করে—এই নীতি অনুসারে রাজকার্য্য ছাড়া অন্য কার্য্যেও—রেলে, ষ্টীমারে, কলকারখানায়, শিল্পবাণিজ্যে—সর্ব্বত্র বেসরকারী ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে উচ্চ কর্ম্মের গণ্ডীর বাইরে রেখেছে। ইংরেজ স্বজাতিবৎসল, তাই তার স্বদেশের কর্ম্মহীনতার লাঘব করবার জন্য এদেশের কর্ম্মহীনতার বৃদ্ধি করতে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

* Quoted in Education in India under the East India Company by Major B. D. Basu, p. 82.

এখন অবশ্য কোম্পানীর আমলের চেয়ে শিক্ষার বিস্তৃতি এবং শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক বেড়েছে; সরকারী এবং বেসরকারী কর্ম্মও অনেক বেড়েছে; কিন্তু দুয়ের মধ্যে অনুপাতের সামঞ্জস্য নেই, শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা কর্ম্মের সংখ্যার চেয়ে বহুগুণ বেশী হয়েছে। কর্ম্মের মধ্যে অনেকগুলি আছে যাতে শ্রমশিল্প-নিপুণতার আবশ্যক। স্কুল-কলেজে সে শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, সুতরাং অফিসের কেরাণীর কাজের জন্য যতগুলি শিক্ষিত লোকের আবশ্যক ততগুলি সেই কাজে নিযুক্ত হচ্ছেন; অবশিষ্ট যাঁরা থাকছেন, বিবিধ শ্রমশিল্পের কাজে তাঁদের স্থান হওয়া উচিত, কিন্তু তার জন্য যে কলাকৌশলের জ্ঞান আবশ্যক, সাধারণ শিক্ষিতের তা' নেই। কাজেই কতকগুলি কর্ম্ম থাকতেও তাঁরা পাচ্ছেন না। বেকার-কমিটির (Unemployment Committee) রিপোর্টে প্রকাশ যে ঐ কমিটির কাছে যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁদের অনেকের মতে এই শ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রলোক সে রকম কাজের যোগ্য নয়। কমিটি বলেন—

"So far as the large body of educated middle class Bengali unemployed are concerned, many witnesses are

inclined to consider them at present unqualified for the employment available.......They have not received the type of education which would enable them to adapt themselves and acquire the necessary further training for these occupations."

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের চাকরির এই অবস্থা। কিন্তু চাকরি ছাড়া আরও অনেক কর্ম্ম আছে যাকে শিক্ষিতের ব্যবসায় (learned profession) বলা যায়। আইন এবং চিকিৎসা তার মধ্যে প্রধান। আইন-ব্যবসায়ে প্রথমে ইংরেজী শিক্ষার আবশ্যক ছিল না। তারপর সামান্য ইংরেজী জানলেই চলত। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে আইনের উপাধি-পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হল এবং সেই উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে কেউ উকীল হতে পারত না। কিন্তু কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভর না করে' হাইকোর্ট একটা নিম্নতর পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করেছিলেন। তারও নীচে ছিল মোক্তারি পরীক্ষা। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের উপাধিপরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা অনেক হওয়াতে নিম্ন ওকালতী এবং মোক্তারি পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও উকীলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, প্রতি বৎসর আড়াই শ' তিন শ' উকীল বিশ্ববিদ্যালয় বা'র করছেন। উকীলদলে অবশ্য অত পদ প্রতিবৎসর খালি হয় না। তার ফলে অনেক বি-এল উপাধিধারী অফিসের কেরাণীগিরিতে প্রবেশ করেছেন, অনেকে শিক্ষকতা করছেন, অনেকে আরও কত কি করছেন। উকীলের সংখ্যাবৃদ্ধির একটা পরোক্ষ ফল এই হয়েছে যে, সামান্য কারণে বা অকারণে লোকে মোকদ্দমার জালে জড়িত হয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। আগে

গ্রাম্য পঞ্চায়েত সামান্য সামান্য বিবাদের বিচার করে' মিটিয়ে দিত। এখন সুলভ উকীল সামান্য অসামান্য সকল রকম বিবাদই আদালতে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। এই উকীলদের আবার দালাল (tout) আছে, এরা নিরীহ গ্রাম্য লোককে সত্যমিথ্যা নানা কথায় ভুলিয়ে উকীলের কাছে নিয়ে যায় এবং উকীল যে ফী পান তার একটা অংশ নেয়। উকীলের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ দালালের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের উপদ্রব এত বেশী যে তার নিবারণের জন্য আইন করেও তা' নিবারণ করা যাচ্ছে না। সংখ্যার আধিক্যে উকীলদের যে কেবল আর্থিক অবনতি ঘটছে তাই নয়, নৈতিক অবনতিও হচ্ছে। তাই আক্ষেপ করে' কবি রজনীকান্ত বলেছেন—

"আমরা জজের প্লীডার
সকল public movementএর leader
And conscience to us is a marketable thing
Which we sell to the highest bidder."

কান্তকবি স্বয়ং উকীল ছিলেন, সুতরাং কথাগুলি কেবল কবির কল্পনাপ্রসূত নয়! উকীলদের এই আর্থিক এবং নৈতিক অবনতির ফলে লোকের যে আর্থিক দুর্গতি হচ্ছে তা' বলাই বাহুল্য। স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, দশ বৎসরের মধ্যে যদি আর একটিও নতুন উকীল না হয়, তা হ'লেও দেশের কোনো ক্ষতি ত হবেই না, লাভই বরং হবে! স্যর আশুতোষ চৌধুরীও শিক্ষিত যুবকদের পরামর্শ দিতেন যে তারা যেন ওকালতী ব্যবসায় না করে। স্যর ভূপেন্দ্রনাথ বসু উকীলদের বলতেন Freebooters.

এ সকল কথা জেনেও যুবকেরা দলে দলে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আদালতের ভিড়গ্রস্ত উকীলখানার ভিড় বাড়াচ্ছেন! কেন? শুনেছি প্রথম 'স্বদেশী' আন্দোলনের সময় বাঙালী শিক্ষিত যুবক যখন বোমা (bomb) নির্ম্মাণে পটুত্ব লাভ করছিল বলে' গবর্ণমেণ্ট সন্দেহ করেন এবং আবিষ্কার করেন যে অন্য কর্ম্মের অভাবেই শিক্ষিত যুবকেরা এই কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছে, তখন একদিন লর্ড হার্ডিঞ্জ কলকাতার একটি ছাত্রাবাসে গিয়ে একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "তুমি কি কর?" ছাত্রটি উত্তর দিয়েছিলেন "আইন পড়ি।" লর্ড হার্ডিঞ্জ জিজ্ঞাসা করেছিলেন "কেন? আইন পড় কেন?" ছাত্রটি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন "আর কি করতে পারি?" লর্ড হার্ডিঞ্জ না কি বলেছিলেন, তিনি চেষ্টা করে' দেখবেন ছাত্রদের 'আর কিছু' করবার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন কি না? লর্ড হার্ডিঞ্জ কি চেষ্টা করেছিলেন, অথবা কোনো চেষ্টা করেছিলেন কি না, তা প্রকাশ নেই; কিন্তু ফলে যে কিছু করা হয়নি সেটা সুস্পষ্ট। এই আইন ব্যবসায় সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। রাজকার্য্যের উচ্চতর পদের জন্য যেমন বিলিতি শিক্ষার ও পরীক্ষার আবশ্যক, এই ব্যবসায়ের উচ্চতম কাজের জন্যও তেমনি বিলিতি শিক্ষার ও পরীক্ষার আবশ্যক। এ দেশে আইন অধ্যাপনা আছে কিন্তু তা'তে ব্যারিষ্টার হয় না, কারণ, ব্যারিষ্টারের গৌরব এত উচ্চ যে এদেশের উচ্চতম আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যিনি দীর্ঘকাল ওকালতী করে' প্রতিপত্তি লাভ করেছেন তিনিও সদ্যোভূত ব্যারিষ্টারের নিম্নতন; প্রশ্ন হতে পারে, ভারতীয় আইন শিক্ষায় ও পরীক্ষায় যদি এমন কোনো ত্রুটি থাকে

যার জন্য ভারতে ব্যারিষ্টার হয় না তা হ'লে সেই শিক্ষা ও পরীক্ষাটাকে বিলিতি শিক্ষা ও পরীক্ষার সমান করে' দিলেই ত হয়? এর উত্তর কি, আমরা জানি না। বোধ হয় এই যে, তা হ'লে বিলিতি ব্যারিষ্টারদের জাত যায়।

চিকিৎসা ব্যবসায় সম্বন্ধেও প্রায় ঐ কথা। আইন ব্যবসায়ের সহিত এর প্রধান পার্থক্য এই যে, এখনকার গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুলে পড়ে' যাঁরা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেরুচ্ছেন তাঁদের অনেকেই সরকারী ও বেসরকারী চাকরি পাচ্ছেন এবং নিচ্ছেন। এদেশের ল-কলেজের পাশকরা উকীলে ও বিলেতের পাশকরা ব্যারিষ্টারে যে প্রভেদ, এদেশের মেডিক্যাল কলেজের পাশকরা ডাক্তারে এবং বিলেতের পাশকরা ডাক্তারে প্রভেদটা তার চেয়েও গুরুতর। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লর্ডসভার সিলেক্ট কমিটির কাছে উইলসন সাহেব এ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দেন তা' থেকে এই প্রভেদের গুরুত্বটা বেশ বুঝতে পারা যায়। উইলসন সাহেব এদেশে সুপরিচিত। তাঁর পুরা নাম হোরেস হেম্যান উইলসন। ইনি কোম্পানীর ডাক্তার হয়ে বিলেত থেকে এদেশে এসেছিলেন, কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় কোনোদিনই করেননি। প্রথম থেকেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণায় নিযুক্ত হন এবং ঐ সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্যলাভ করেন এবং সুপণ্ডিত বলে' খ্যাত হন। এই উইলসন সাহেব লর্ডসভার সিলেক্ট কমিটির কাছে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তাঁর সাক্ষ্যটা তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করছি, অনুবাদে রসভঙ্গ হতে পারে—

"In truth it would be difficult to render the services of native medical attendants acceptable to the Europeans, as there is a great feeling of dislike to them. Europeans in India cannot be made to believe that native surgeons are fully qualified, although, no doubt, many of them are very efficient even as we know; for we have had two or three of them over in this country (England). and one of them particularly was very highly distinguished in the medical classes; he took his degree both at the College of Physicians and the College of Surgeons, Dr. Chuckerbutty; but still you cannot get over the prejudice which Europeans entertain against them.

Lord Boughton. Do you see any objection to the employment occasionally of very eminent medical students in the covenanted service?

H. H. Wilson. *You have to encounter a very strong feeling on the part of all the European society against it.*

Lord Boughton. But if the Europeans did not choose to employ these persons in the medical profession, of course, they would not be obliged to employ them?

H. H. Wilson. At a civil station very often they would have no choice. There is but one medical man attached to a station, and if he were a native officer, whatever his qualifications might be, I am sure there would be a very strong feeling against employing him; *it would be very repugnant to the prejudices of Europeans* ......the other medical officers of the Company would always be inclined to look with jealousy and dislike upon him."

অর্থাৎ এদেশের 'নেটিভ'কে, চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেও, কেবল 'নেটিভ' বলেই, কোম্পানীর covenanted serviceএ প্রবেশ করতে দেওয়া হত না; কারণ, ইউরোপীয়েরা সকলেই তাকে আন্তরিক ঘৃণা করত এবং কোম্পানীর অন্য অন্য মেডিক্যাল অফিসারগণ 'নেটিভ' মেডিক্যাল অফিসারকে ঘৃণা ত করতই, তার উপর ঈর্ষাও ছিল। এই মনোভাব, যার নামান্তর জাতিবিদ্বেষ বা race hatred আজও পূর্ণমাত্রায় আছে। ইউরোপীয়েরা বলেন 'স্বদেশী' যুগের আরম্ভ থেকেই ভারতবাসীর মনে ইউরোপীয়দের প্রতি এই জাতিবিদ্বেষের ভাবটা জন্মেছে। ভারতবাসী স্বদেশকে ভালবেসে বিদেশকে এবং বিদেশীকে বিদ্বেষ করতে আরম্ভ করেছে। উইলসন সাহেবের উপরি উদ্ধৃত সাক্ষ্য থেকে ইউরোপীয়েরা দেখবেন যে, 'স্বদেশী' যুগের বহুপূর্ব্বে এদেশপ্রবাসী ইউরোপীয়দের মনেই এই জাতিবিদ্বেষের ভাবটা প্রথমে জন্মেছিল এবং তখন থেকে ক্রমে ক্রমে পুষ্টিলাভ করে' বর্ত্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। মেডিক্যাল সার্ভিস সম্বন্ধে সেদিনও গবর্ণমেণ্টের কাছে তাঁদের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁদের ও তাঁদের স্ত্রীপুত্র-পরিবারের চিকিৎসার জন্য ইউরোপীয় ডাক্তারেরই আবশ্যক। দেশীয় ডাক্তারের দ্বারা তা' হতে পারে না। উচ্চতর রাজকার্য্যে ভারতবর্ষীয়দের নিয়োগ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসেও সেই নিয়মের প্রয়োগ উপলক্ষ্যে কথাটা উঠেছিল এবং লী-কমিশনও এ বিষয়ের অনুসন্ধান করে' উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের ঐ প্রার্থনা সমর্থন করেছেন। তারপর ইংরেজ চা-করেরা এবং কলকাতার ইউরোপীয় অ্যাসোসিয়েশন কলকাতার ইডেন হাসপাতালের ভারতবর্ষীয়

ডাক্তারের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের কাছে সেদিন আবেদন করেন যে, তাঁর স্থানে একজন ইউরোপীয় ডাক্তার দেওয়া হ'ক। কারণ, ইডেন হাসপাতালে অনেক ইউরোপীয় নারী চিকিৎসার জন্য যায়।

ডাক্তারদের উচ্চতর চাকরির এই অবস্থা। নিম্নতর চাকরিগুলিতে মেডিক্যাল কলেজের উপাধিধারীদের প্রবেশের পক্ষে কোনো নিয়মের বাধা নেই ; কিন্তু চাহিদা-ও-যোগানের (demand and supply) নিয়ম সর্ব্বত্রই আছে। যতগুলি ছাত্র মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করতে চান, ততগুলিকে নেওয়া হয় না ; প্রতিবৎসর প্রায় হাজার ছাত্র ভর্ত্তি হবার জন্য দরখাস্ত করেন, কিন্তু এক শ' দেড় শ'র বেশী নেওয়া হয় না ; শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত আবার সকলে পৌঁছুতে পারেন না ; যাঁরা পারেন, তাঁদের মধ্যে আবার সকলে উত্তীর্ণ হতে পারেন না। আবার যতগুলি উত্তীর্ণ হন তাঁদের মধ্যে সকলে চাকরি পান না। যাঁরা চাকরির "সৌভাগ্যে" বঞ্চিত হন, তাঁরা চিকিৎসা ব্যবসায় করেন ; কিন্তু যেখানে চিকিৎসকের অত্যন্ত আবশ্যক সেখানে নয় ; পল্লীগ্রামে তাঁরা যেতে চান না কারণ, পল্লীগ্রামের লোক দরিদ্র, তাঁদের উপযুক্ত দর্শনী দিতে পারে না। সকলেই সহরে ব্যবসায় করতে চান। সহরে যে কেবল মেডিক্যাল কলেজের উপাধিধারী ডাক্তারদের সঙ্গেই তাঁদের প্রতিযোগিতা করতে হয়, তা' নয় ; তাঁদের প্রতিযোগীদের মধ্যে আছেন কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ, হকিম সাহেব এবং কোনো প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্রের ঋণ স্বীকার করেন না অথচ সর্ব্বরোগ-আরোগ্যকারী নামোপাধিবর্জ্জিত চিকিৎসকগণ। মেডিক্যাল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারগুলি ত আছেনই ; তাঁদের স্কুলের সংখ্যাও ক্রমেই বাড়ছে

এবং এই সকল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যাও অবশ্য বাড়ছে। প্রতিযোগিতাও অবশ্য কঠিন হতে কঠিনতর হচ্ছে। সুতরাং চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত বেকার বা অর্দ্ধ-বেকারের সংখ্যা যথেষ্টের চেয়েও বেশী। সমাজের তথাকথিত "ইতর" শ্রেণীকে বাদ দিয়ে, কেবল "ভদ্র" শ্রেণীর লোকের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করলে যে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে, এই চিকিৎসা ব্যবসায় তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। দেশে আর যা' কিছুর অভাব থাক, রোগের অভাব নেই। বাঙলার পল্লীগুলি ম্যালেরিয়া কলেরায় জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অধিকাংশ গ্রামেই ডাক্তার নেই। কারণ, পল্লীগ্রাম দরিদ্র, ডাক্তারের আকাঙ্ক্ষা বড়, দরিদ্র পল্লীতে সে আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় না। উকীল ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরও ঐ কথা। সকলেই পল্লীগ্রাম ত্যাগ করে' সহরে গিয়ে সকল ব্যবসায়ে জনতার বৃদ্ধি করছেন। তার ফল হয়েছে মক্কেলের চেয়ে উকীল বেশী, রোগীর চেয়ে ডাক্তার বেশী, খরিদদারের চেয়ে দোকানদার বেশী।

২১

অর্থনীতি-শাস্ত্রের একটা তথ্য এই যে, যে-জিনিষের যত প্রয়োজন তার চেয়ে যদি তা' বেশী উৎপন্ন হয় ত অতিরিক্ত অংশটার কাটতি হয় না এবং তার ফলে প্রয়োজনীয় অংশটার দাম কমে' যায়। এই তথ্যটি কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের বাজারে যেমন সত্য, শিক্ষার বাজারেও তেমনি সত্য। এবার এদেশে পাট খুব জন্মেছে, আমেরিকায় তূলো খুব জন্মেছে; চটের কলওয়ালারা সাধারণতঃ যত পাট কিনে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী পাট জন্মেছে; কাপড়ের কলওয়ালারা সাধারণতঃ যত তূলো কিনে থাকে, তার চেয়ে তূলো জন্মেছে অনেক বেশী। ফলে পাটের দাম আর তূলোর দাম এবার খুব কমে' গেছে। তেমনি স্কুল-কলেজে শিক্ষিত ছেলে জন্মাচ্ছে খুব বেশী; নিয়োগ-কর্ত্তারা যত চায় তার চেয়ে অনেক বেশী। এই শিক্ষিত মানে কেবল 'পাশ'করা নয়, 'ফেল'করাও তার মধ্যে আছে। কারণ, 'পাশ'-করারও যেমন জীবনধারণের জন্য কর্ম্মের আবশ্যক, 'ফেল'করারও তেমনি আবশ্যক। পরীক্ষা-সাগর পার হতে না পারলে যে সংসার-সাগরে ডুবে মরতে হবে, এমন নিয়ম এখনও প্রচলিত হয়নি। ফলে চাকরির বাজারে শিক্ষিতের দাম কমে' গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সোপাধিকেরা নিরুপাধিকের দরে আত্মবিক্রয় করছেন। এবারকার

পাট সম্বন্ধে প্রস্তাব হয়েছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশটাকে নষ্ট করে' ফেলে' প্রয়োজনীয় অংশের মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া। আমেরিকার তূলো সম্বন্ধে প্রস্তাব হয়েছে অতিরিক্ত অংশটা বিক্রয়ের জন্য বাজারে না এনে আগামী বৎসরের জন্য ধরে' রাখা। তাতে বহু অর্থের আবশ্যক, কৃষকের তত অর্থ নেই। কিন্তু আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট তার জন্য একটা ব্যাঙ্কার-সমিতির স্থাপন করেছেন। ব্যাঙ্কার-সমিতি এই কাজ করতে অগ্রিম মূল্য দিয়ে কৃষককে সাহায্য করেছেন। ইংলণ্ডে বাজারের চাহিদার সঙ্গে যোগানের সমতা রক্ষা করবার জন্য অনেক ব্যবসায়ে মূল্য নির্দ্ধারণী সমিতি (price-fixing association) আছে। তাদের উদ্দেশ্য উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ এবং মূল্য নির্দ্ধারণ করে' দেওয়া। নির্দ্ধারিত পরিমাণের বেশী কোনো দ্রব্য কেউ উৎপাদন করলে তার অর্থদণ্ড হয় এবং সেই অর্থ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের ক্ষতি পূরণ করে' দেওয়া হয়। তাদের কাজ হচ্ছে পণ্য দ্রব্যের উৎপত্তির হ্রাস করে' তার দুর্মূল্যতার সৃষ্টি করা। চা এবং রবারের ব্যবসায়ে এই রীতি খুব প্রবল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় চা-বাগানওয়ালারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে শতকরা ১৫ ভাগ চা কম উৎপাদন করেছিলেন এবং পাউণ্ড প্রতি চার আনা থেকে ছ' আনা পর্য্যন্ত দাম বাড়িয়েছিলেন। তাতে তাদের লাভ বেড়েছিল শতকরা ৯৲ টাকা থেকে ১৯৲ টাকা পর্য্যন্ত। তারপরে তাদের লভ্যাংশ (divident) কোনো কোনো কোম্পানীর শতকরা ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠেছে। রবারের চাষীরা রবারের পরিমাণ কমিয়েছিল শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ, তাতে দাম চড়ে' গিয়েছিল পাউণ্ড প্রতি ছ' আনা থেকে ১৲ এক টাকা। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ব্যবসায়-বাণিজ্য 'মন্দা'

হয়েছিল ; ইউরোপে অন্নকষ্ট হয়েছিল ; রুষিয়ায় ত দুর্ভিক্ষই হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকায় সে বৎসর প্রচুর গম ও মকাই জন্মেছিল। কিন্তু সে গম ও মকাই ইউরোপে না পাঠিয়ে দিয়ে তারা পুড়িয়ে নষ্ট করেছিল। এ সকল কৌশল কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের মূলধনীদের। শ্রমজীবীদের পরিশ্রমের মূল্য বৃদ্ধি করবার উপায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পরিশ্রমের মূল্য নির্দ্ধারণ করা এবং নির্দ্ধারিত মূল্যের কমে কোনো কর্ম্মে নিযুক্ত না-হওয়া। এইরূপ সঙ্ঘেরই নাম Trade Union বা ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ। এখন যারা কোনো কর্ম্মে নিযুক্ত আছে তারাই নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য Trade Union করেছে, কিন্তু যারা কর্ম্মের প্রার্থী, এখনও কোনো কর্ম্মে নিযুক্ত হয়নি, তাদেরও নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিত। আর, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের উচিত শিক্ষিতের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা এবং নির্দ্ধারিত সংখ্যার অতিক্রমকে দণ্ডনীয় করা। এর বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, এরূপ করলে শিক্ষিতের সংখ্যা কমে' যাবে। একেই ত দেশের লোকের অধিকাংশ নিরক্ষর, তার উপর শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করলে নিরক্ষরের সংখ্যা অপরিমিত এবং অপরিমেয়রূপে বেড়ে যাবে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস অনুসারে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৩১,৬০,৫৫,২৩১ ; তার মধ্যে নিরক্ষর ২৯,৩৪,৩১,৫৮০ ; লেখাপড়াজানা ২,২৬,২৩,৬৫১ ; আর ইংরেজীজানা ২৫,১৭,৩৫০ ; অর্থাৎ লেখাপড়াজানা লোকের সংখ্যা শতকরা ৭ জনের কিছু উপর ; আর অক্ষরপরিচয়-হয়নি-এমন-নিরেট লোকের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৯৩ জন! আর ইংরেজীজানা লোকের সংখ্যা হাজারে ৮ জন মাত্র অর্থাৎ এক শ' জনের মধ্যে একজনও নয়।

শিক্ষা এবং শিক্ষিতের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করলে নিরক্ষরতা আরও ঘনীভূত হবে, অজ্ঞান-অন্ধকার সূচিভেদ্য হবে। সুতরাং আপত্তিটি খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু, বলা বাহুল্য, প্রাথমিক শিক্ষা, এ শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নয়। সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা যে সর্ব্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত আজকার দিনে সে কথার উল্লেখই অনাবশ্যক। তার অভাবই বরং জনসাধারণের কর্ম্মহীনতার একটা প্রধান কারণ। যে রয়াল কৃষিকমিশনের অধিবেশন আজকাল চলছে, তার কাছে যারা সাক্ষ্য দিচ্ছেন তাঁরাও বলছেন কৃষকদের প্রাথমিক শিক্ষার অভাবে কৃষির উন্নতি হচ্ছে না; শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিবিধানের জন্য যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশন বসেছিল তারও মতে শ্রমজীবীদের প্রাথমিক শিক্ষার অভাবে শ্রমশিল্পের উন্নতি হচ্ছে না। গবর্ণমেণ্টও এখন এসকল কথা অস্বীকার করেন না। তবুও যে প্রাথমিক শিক্ষা সর্ব্বজনীন হয়নি কেন, তার হেতু, ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সচিবের ভাষায়—"administrative reasons of decisive weight". যে শাসননৈতিক গুরুতর কারণের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সুতরাং যে শিক্ষার পরিমাণ এবং শিক্ষিতের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করবার কথা বলছি সেটা প্রাথমিক শিক্ষার পরের শিক্ষা—secondary education এবং higher education. আর, শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ শিক্ষা নিষিদ্ধ করা নয়; শিক্ষার গতি ফিরিয়ে, প্রকার পরিবর্ত্তন করে', যাতে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্ববিধ কর্ম্মে শিক্ষিতের দক্ষতা লাভ হয় তাই করা এবং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় শিল্পে, বাণিজ্যে ও ব্যবসায়ে যত কর্ম্ম আছে, শিক্ষিতের সংখ্যা সেই হিসাবে নির্দ্ধারিত করা। শিক্ষা-

বিভাগের কর্ত্তারা এইরূপ একটা হিসাব প্রস্তুত করতে পারেন। যারা কেবল জ্ঞানের জন্য শিক্ষালাভ করতে চায়, তাদের কথা স্বতন্ত্র, তারা থাকবে এই হিসাবের বাইরে। কিন্তু যারা অধীত বিদ্যাদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে' সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে চায়, তারা এই হিসাবের মধ্যে থাকবে। শিক্ষাবিভাগ এই হিসাব অনুসারে শিক্ষিত কর্ম্মী উৎপাদন করবে। আপাততঃ এটা কঠিন বলে' মনে হতে পারে, কিন্তু কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। জারমানিতে, শুনেছি, এই রকম একটা ব্যবস্থা আছে। দেশে কলকারখানা, শিল্পবাণিজ্য, খনি, রেল, ষ্টীমার, প্রভৃতি যত কর্ম্মশালা আছে এবং তাতে যত লোক নিযুক্ত আছে তার মধ্যে মৃত্যু, কর্ম্মত্যাগ, অবসর নেওয়া ইত্যাদি দ্বারা কতগুলি জায়গা খালি হয় তার অবধারণ করা কিছু কঠিন নয়। সরকারী অফিসাদিতে প্রতিবৎসর এটা হয়েই থাকে। সওদাগরী অফিসেও হয়। যেখানে হয় না, গবর্ণমেণ্ট আদেশ করলে সেখানেও এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হতে পারে। তারপর সকল জায়গা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে' সমস্ত দেশের জন্য বাৎসরিক আয়ব্যয়ের বজেটের মত একটা কর্ম্মীর 'বজেট' প্রস্তুত করা যেতে পারে। তারপর এই হিসাব অনুসারে সর্ব্ব প্রকার শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করা কিছুমাত্র কঠিন হবে না। পূর্ব্বেই বলেছি, যারা কেবল জ্ঞানের জন্যই শিক্ষিত হতে চায় তারা এই হিসাবের মধ্যে থাকবে না, তাদের হিসাব স্বতন্ত্র। এ হিসাবের মধ্যে থাকবে তারাই যারা শিক্ষিত বিদ্যা বিক্রী করে' বা ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জ্জন করবে। যারা নিজের ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিজের শিক্ষিত বিদ্যার প্রয়োগ করবে তারাও

অবশ্য এ হিসাবের মধ্যে থাকবে। এইরূপ একটা সম্পূর্ণ হিসাব প্রস্তুত করতে পারলে দেশের সমস্ত কর্ম্মের এবং কর্ম্মীর অবস্থা বুঝতে পারা যাবে এবং অবস্থা বুঝতে পারলে যেখানে যেমন হ্রাস বা বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন সেখানে তেমনি করা যেতে পারে। যদি বেকার সমস্যার সমাধান করবার অকপট আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে সকলের আগে এই রকম একটা বিবৃতির (statement) আবশ্যক। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা। আগে জ্ঞান চাই, তারপর কর্ত্তব্য নির্ণয়। গবর্ণমেণ্টের একটা statistical department আছে, অন্যান্য বিভাগেও সেই সেই বিভাগের বিবরণ (statistics) সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সে সকল statistics অসম্পূর্ণ, অনেকস্থলে যা' আবশ্যক তা' নেই, যা' অনাবশ্যক তা' যথেষ্ট আছে। এইগুলির আমূল সংস্কার করে' একটি নতুন Labor Bureau করতে হবে। কোনো কোনো প্রদেশে Labor Bureau আছে, কিন্তু সেখানেও পূর্ব্বকথিতরূপ সকল বিবরণ পাওয়া যায় না। যাতে পাওয়া যায়, এখন সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

এ সম্বন্ধে বেকার-কমিটি (Unemployment Committee) বলেন—

"Some may hold that it is not the duty of an educational authority to estimate the supply and demand in any particular labor market and to try to control the supply accordingly. They may hold that each member of the community should be allowed to find his own level. This may have been the attitude in western countries

generally, but we know at least one recent case in the west where definite control of the supply has been directly and consciously undertaken by the educational authority through its standards of examination, We know that no guarantee has been given, or, in fact, can be given, that a certain course of training will result in material profit or in employment, still we consider it the duty of an educational authority to make definite efforts to prevent the entire equilibrium of any particular labor market being upset as a result of the absence of control of the course of training provided by it. We hold therefore, that it would be one of the functions of the Board mentioned above (Board of Control of Apprenticeship Training) to survey, and, as far as possible, to forecast the probable supply and demand in any particular field within their control. Otherwise technical education and training which so many of our witnesses seem to consider as a panacea, would lead to a state of things in another field very similar to the present state. We realize the difficulties involved in any effort to control the supply to the demand but we consider that this aspect of the question merits careful attention and should not be lost sight of."

এই উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করবার জন্য তার পরিমাণের হ্রাস করা আর শিক্ষিত কর্ম্মীর কর্ম্মহীনতা দূর করবার জন্য এবং তার উপার্জ্জন বৃদ্ধি করবার জন্য শিক্ষিতের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করার নীতি আর একটু প্রসারিত করলেই দেশের লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করা এবং ব্যক্তির সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করার সমস্যা উপস্থিত হয়।

২২

দেশের অধিবাসীসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে যে বেকার সমস্যার সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ তা' বলাই বাহুল্য। দেশের অধিবাসীই কর্ম্মের সৃষ্টি করে এবং তাদের আধিক্যই কর্ম্মের অভাবের সৃষ্টি করে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে পাঁচবার সেন্সাস নেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় পুরুষের সংখ্যা বেড়েছে ৩,৪০,৪৬,২৬৪ বা শতকরা ২৬·২; স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩,০৯,৯৯,৮৩৬ বা শতকরা ২৫ জন; মোট বৃদ্ধি ৬,৫০,৪৬,১৫০ বা শতকরা ২৫·৬। ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি সাক্ষাৎ যমদূতগুলি স্থায়ীভাবে উপনিবেশ স্থাপন করা সত্ত্বেও এই লোকবৃদ্ধি। কিন্তু এই বৃদ্ধির দ্বারা দেশের কি কোনো উপকার হয়েছে? কোনো লাভ হয়েছে? এমন একদিন ছিল, যখন অধিবাসীর সংখ্যা ছিল অল্প এবং জমি ছিল বিস্তর। রাজার জনবলবৃদ্ধির জন্য লোকবৃদ্ধির আবশ্যক ছিল এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থারও অভাব ছিল না। যে জাতিভেদ এখন ভারতবাসীর স্কন্ধে অপদেবতার মত ভর করে' বসে' অন্য অন্য নানা অনিষ্টের মধ্যে বিবাহে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, সেই জাতিভেদ তখন বিবাহ বিষয়ে মহা উদার ছিল; ব্রাহ্মণ স্বর্বণ-অসবর্ণ

নির্ব্বিশেষে স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করতে পারতেন; ক্ষত্রিয় বৈশ্যও সবর্ণে এবং নিম্নতনবর্ণে বিবাহ করতে পারতেন। যৌন সম্মেলন মাত্রই ছিল বিবাহ। এখন যে যৌন সম্মেলন দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয়, তখন তা'ও বিবাহ বলে' খ্যাত হত, তা' রাক্ষস বিবাহই হ'ক, আর পৈশাচিক বিবাহই হ'ক। মনু বলে' দিয়েছিলেন, নরনারীসৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিল সন্তান প্রজনন—"প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।" সুতরাং বিধবারও সন্তান উৎপাদনে বাধা ছিল না, তা' বিবাহের দ্বারাই হ'ক আর নিয়োগের দ্বারাই হ'ক। তার উপর যথাকালে স্ত্রীসম্মেলন ছিল অলঙ্ঘনীয়, লঙ্ঘন করলে বাছুর-মারার পাতক হত। সর্ব্বোপরি ছিল পিতৃ-পুরুষের পিণ্ডোদক লোপের ভয়। এই সকল বিধি-ব্যবস্থার ফলে দেশে প্রজাবৃদ্ধি হল, প্রথমে যথেষ্ট, তারপর যথেষ্টের চেয়ে বেশী। ক্রমে পিতৃঋণ পরিশোধ করতে গোয়ালার ঋণ, মুদীর ঋণ, কাপড়ের দোকানের ঋণ অপরিশোধ্য হয়ে উঠল। বহু সন্তান-জনকের আর্থিক অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হল। তখন অর্থশাস্ত্রী বললেন, "বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য।" খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রেও বংশবৃদ্ধির আদেশ আছে—Live and multiply. চীন এবং জাপানেও এইরূপ বিধি-ব্যবস্থা।

কিন্তু মানব-সমাজ যখন আদিম অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে চিন্তার স্বাধীনতা লাভ করলে, বুঝলে ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ ধর্ম্মযাজক প্রমুখাৎ প্রকাশিত রাজারই আদেশ এবং সে আদেশ প্রতিপালনের ফলে রাজার সৈন্যবল বৃদ্ধি হয়, রাজার শক্তি বৃদ্ধি হয়, তখন সমাজ লোকসংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়টাকে পরলোক থেকে ইহলোকে নামিয়ে

এনে সমাজের দিক থেকে এবং সামাজিক ব্যক্তির দিক থেকে দেখতে লাগল। সমাজের দিক থেকে দেখা গেল প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে লোকবৃদ্ধি আহার্য্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে না; আহার্য্যবৃদ্ধির সীমা আছে, এবং সেই সীমার মধ্যে আবার অনেক বিঘ্ন আছে; আর লোকবৃদ্ধির সীমা নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই হিসাবে লোকবৃদ্ধি চলতে পারত কিন্তু প্রকৃতিই আবার অসমঞ্জস বৃদ্ধি নিবারণ করে দুর্ভিক্ষ দিয়ে, মহামারী দিয়ে এবং যুদ্ধ দিয়ে। ইউরোপ-আমেরিকায় এখন আর দুর্ভিক্ষ-মহামারীকে লোকক্ষয় করতে দেওয়া হয় না; সেখানকার লোক এখন দেশের অতিরিক্ত লোকের আহার্য্যের অভাব পূরণ করতে আপনা-আপনির মধ্যে যুদ্ধ করে; অথবা দল বেঁধে পরের দেশে 'যুদ্ধং দেহি' বলে' যায়। এখন এসিয়া এবং আফ্রিকা এইরূপ যুদ্ধের রঙ্গভূমি হয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নেই, আহার্য্যের অন্বেষণে কোথাও যুদ্ধ করতে যাওয়াও নেই; যাওয়া আছে মজুরী করতে; কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকা সেখানে যেতে দেয় না, আফ্রিকাও নিষিদ্ধ দেশ। কাজেই ভারতবর্ষের লোকবৃদ্ধি-নিবারণের জন্য আছে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। এ সম্বন্ধে এক চিন্তাশীল ইংরেজ সমাজতত্ত্ববিদের মত উদ্ধৃত করছি—

"The connection between over-population and war is now-a-days fairly obvious and is particularly manifest in those countries which are both industrially organized and consciously nationalist in spirit. In the absence of these two conditions, over-multiplication need not be followed

by war. India and China, for instance, are very densely populated countries where over-multiplication frequently takes place. This process does not, however, give rise to much danger of international disturbance, in that both countries are, from the nature of their organization, incapable of conducting war on modern lines, and neither has a generally felt, or a unifying national consciousness. Excessive increase is here frequently *checked by famines* which, though causing incalculable suffering, do not readily generate wars."

অর্থাৎ অত্যধিক লোকবৃদ্ধির সঙ্গে যুদ্ধের যে সম্পর্ক আছে তা' এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। চীন এবং ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক কিন্তু সেখানে জাতীয়তাবোধজনিত একতাবন্ধন নেই। সুতরাং তারা আধুনিক প্রণালীতে যুদ্ধ করতে অক্ষম। কাজেই সেখানে লোকবৃদ্ধির আধিক্য দুর্ভিক্ষের দ্বারা শাসিত হয়।

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জারমানির লোকসংখ্যা খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল, এত বৃদ্ধি যে, জারমানি সেই বিবৃদ্ধ লোক-সংখ্যার ভরণপোষণ করতে অসমর্থ হয়েছিল। সে সম্বন্ধে এই ইংরেজ সমাজতত্ত্বজ্ঞ বলেন—

"In Germany before the war, where the 'military' objection to Birth control, first advanced, was prevalent, there existed an ethical code by which German mothers were persuaded that they were fulfilling the highest spiritual purpose of which their sex was capable by producing male children destined to be soldiers, prepared to fight for their country in a victorious war. ....The

increase in the population of Germany was advocated and extolled without regard to that country's capacity to support her swelling population. To-day, though Birth control is largely practised by the upper and middle classes in Germany, as it is in this country (England), the old ideal still lingers on, and to it is attributable that fear of Germany which, until recently, has so conspicuously directed French policy since the Armistice."

ইংলণ্ডের লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে বেকার সমস্যার সম্বন্ধ বিষয়ে এই ইংরেজ সমাজতত্ত্ববিৎ বলেন—

"Quantitatively, it has been pointed out that in the last hundred years, the increase in the population of this country (England) has been excessive. Because England was the pioneer of the Industrial Revolution, she enjoyed initially an unprecedented national prosperity, unharassed by competitors and with the world as her market. Though the conditions of many of the early factory-workers were unquestionably appalling, the wealth and economic importance of this country increased so rapidly that she was enabled to support immensely greater numbers than at any previous period of her history.

"Thus in 1821 the population of England and Wales was just over 12 millions; in 1921 it had risen to nearly 38 millions. That is to say that in a hundred years our population had more than trebled.

"When, however, at the beginning of this century other countries began to enter into competition with us, and to produce manufactured goods on a large, scale,

often underselling British goods, our hitherto unchallenged industrial supremacy gradually commenced to suffer eclipse. *But our numbers have not adapted themselves to our diminished power of employing labour thus created. On the contrary, the population has continued steadily to inerease, with the result that by slow degrees the unemployment problem which, at present, looms so large on our political horizon began insidiously to disclose itself.* The present formidable figure of nearly a million and a quarter of unemployed, together with a large number of workers on short hours, testifies to the fact that at the present time in relation to existing economic conditions, this country seems to be over-populated,"

অর্থাৎ গত একশ' বছরে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেড়েছে। ইংলণ্ড শ্রমশিল্পে সকল দেশের অগ্রণী ছিল; তার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না; পৃথিবীর সর্ব্বদেশে অবাধে তার পণ্য বিক্রী হত; তার ফলে ইংলণ্ডের অতুল ঐশ্বর্য্য হয়েছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা ছিল এক কোটী বিশ লক্ষের কিছু উপর। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হয়েছিল তিন কোটী আশী লক্ষ; অর্থাৎ ঠিক একশ' বছরে লোকসংখ্যা তিনগুণেরও বেশী হয়েছিল। কিন্তু এই শতাব্দীর আরম্ভে অন্য অন্য দেশ ইংলণ্ডের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগল, তাদের শিল্পপণ্য ইংলণ্ডের শিল্পপণ্যের চেয়ে কম দামে বিক্রী করতে লাগল, ইংলণ্ডের অপ্রতিহত উন্নত শিল্পপ্রাধান্যের অবনতি হতে আরম্ভ হল। ইংলণ্ড এখন আর পূর্ব্বের মত শ্রমজীবীদের কাজ যোগাতে পারছে না, লোকসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে আর বেকার সমস্যাও সেই

সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে। এখন ইংলণ্ডে বেকারের সংখ্যা সাড়ে বার' লক্ষ; তার উপর আছে আরও অনেক শ্রমজীবী যারা যত কাজ করতে পারে তত কাজ পায় না, অল্প সময়ের জন্য অল্প কাজে অল্প মজুরি নিয়ে কষ্টে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এ সমস্তই হচ্ছে ইংলণ্ডের অত্যধিক লোকবৃদ্ধির ফল।

দেশের লোকসংখ্যা সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই হওয়া উচিত যে, দেশ যত লোকের ভরণপোষণ করতে সমর্থ, দেশের লোক তার চেয়ে বেশী না হয়, কারণ, বেশী হলেই তাদের ভরণপোষণের জন্য পরের দেশে যেতে হয়; এবং যাদের দেশে যাওয়া যায় তাদের সঙ্গে বিবাদ হয় এবং সেই বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হয়। যে ইংরেজ সমাজ-তত্ত্ববিদের কথা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করেছি তিনি (C. P. Blacker, M. R. C. S.) বলেন—

"The population of each country should be proportionate to its resources. The numerical adjustment should be such that there be no unemployment and that individual productivity be highest without idlers at either end of the social scale."

লোকবৃদ্ধির আধিক্যহেতু দেশে দেশে যুদ্ধ হলে তার ফল যে কত বিষময় হয় তা' গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ বেশ করে' দেখিয়ে দিয়েছে। ইউরোপ যে সভ্যতার গর্ব্ব করে সেই সভ্যতাই এইরূপ যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সে সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে আবার নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু এই নতুন সভ্যতার ফলভোগ করতে লোক থাকে না। মিঃ ব্ল্যাকার বলেন—

"The fact remains that if the price that humanity will have to pay for learning to regulate its over-multiplication is to be a second world-war—the much talked of war, this time, between East and West—it is doubtful if there will be left a civilization capable of learning the lesson. It seems worth while, therefore, to try to put the principle into effect before we are taught its necessity in such a way." *

এই লোকবৃদ্ধি দু' রকমের—(১) সংখ্যাবৃদ্ধি, (২) উৎকর্ষ বৃদ্ধি। সংখ্যাবৃদ্ধির কথা বলেছি। উৎকর্ষবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায় যে, আমেরিকা ও ইউরোপে যাঁরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধনবান, সম্ভ্রান্ত, যাঁরা জীবনধারণের অর্থ বোঝেন, কষ্টেস্থষ্টে দেহপিঞ্জরে প্রাণপাখীটিকে বদ্ধ করে' রাখামাত্র নয়, কিন্তু শরীর মনের সমস্ত বৃত্তিগুলির মধ্যে পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করে' যাতে তাদের সম্যক স্ফূর্তি হয়, সেই চেষ্টা করে' সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করা এবং তার দ্বারা জীবনকে সুখময় ও আনন্দময় করা, এবং সন্তানদের জন্য সেই সুখ-সম্পদের সংস্থান করা ; তাঁরা অকালে বহু সন্তানের জনক-জননী হয়ে সে আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিঘ্ন উৎপাদন করতে চান না। তাঁরা নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত চানই, সন্তান-সন্ততির জন্যও তাঁরা সংস্থান করতে চান। আমরাও যে তা' চাই না, তা' নয়, কিন্তু আমাদের চাওয়া মানে আমাদের ইচ্ছা মাত্র। আর ইউরোপ ও আমেরিকার উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর নরনারী সে ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করে ; যতদিন না সে সামর্থ্য জন্মে ততদিন তারা বিবাহই করে না, আর বিবাহ করলেও সন্তান উৎপাদন করে না, করলেও দু-একটির বেশী নয়।

* Birth control and the State.

ফ্রান্স এ বিষয়ে সকল দেশের অগ্রণী। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের অধিবেশনে ফ্রান্সের বিজ্ঞান-সভায় মঁসিয়ে লাগানো (M. Laganeau) ফ্রান্সের প্রজাবৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তা' থেকে জানা যায়, কুড়ি বছরের বেশী বয়সের লোকের মধ্যে হাজারকরা ৬০৯ জন বিবাহ করে, আর এইরূপ বিবাহিত লোকের মধ্যে হাজারকরা ২০০ পরিবার নিঃসন্তান, আর ৬৪০টি পরিবারের সন্তানসংখ্যা প্রত্যেকটিতে দুটির বেশী নয়। এর কারণ সম্বন্ধে মঁসিয়ে লাগানো বলেন, ফরাসী নরনারী তাদের সন্তানদের জন্য উপযুক্ত সংস্থান করতে না পারলে সন্তান চায় না। এইরূপে সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করবার ফলে ফ্রান্সে অযথা লোকবৃদ্ধি নেই। মৃত্যুর চেয়ে জন্মের হার বেশী ইংলণ্ডে হাজারকরা ১৩, জারমানিতে ১০, ফ্রান্সে ১, অনেক সময় তা'ও নয়। মঁসিয়ে পি, লেরয় বয়লো (M. P. Leroy Beaulieu) তাঁর The influence of civilization upon the movement of population পুস্তকে বলেন, ফ্রান্সে যা' কিছু লোকবৃদ্ধি হয়েছে তা' কেবল দরিদ্রের মধ্যেই হয়েছে ; যারা শিক্ষিত যাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল, জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যভোগের আকাঙ্ক্ষা বেশী তারা বংশবৃদ্ধি চায় না—

"Thus what it has been agreed to call civilization, which is really the development of material ease, of education, of equality, and of aspirations to rise and to succeed in life, has undoubtedly conduced to a diminution of the birth-rate......and ambition is certainly opposed to the contraction of marriages and the voluntary acceptance of the burdens of a family."

ইংরেজদের সম্বন্ধে মিঃ ব্ল্যাকারও ঐ কথাই বলেন, লোকে যতদিন না সন্তানের লালনপালন এবং শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে সমর্থ হয় ততদিন তারা সন্তান চায় না। এরূপ করে অবশ্য তারাই যাদের সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে। যারা অকর্ম্মণ্য, দরিদ্র, সন্তানের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানশূন্য, তাদের বংশবৃদ্ধিও অবাধ, অসংখ্য। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্মহার থেকে এটি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়—শিক্ষকদের মধ্যে জন্মহার হাজারকরা ৯৫, ধর্ম্মযাজকদের ১০১, ডাক্তারদের ১০৩, আর সাধারণ শ্রমজীবীদের ২৩১। শ্রমজীবীদের মধ্যেও আবার যারা অলস, কর্ম্মহীন, অপরিণামদর্শী, স্ত্রীপুত্রের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন, তারাই বহু সন্তানের জনক। বারট্রাণ্ড রাসেলও ঐকথা বলেন। আজকাল জীবনযাত্রা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, সুশিক্ষা ততোধিক; কাজেই যারা সন্তানকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে পালন করতে চায়, তাকে সুশিক্ষা দিতে চায়, তাদের জীবনযাত্রার কিছু পাথেয় দিতে চায়, তারা সন্তান চায় না, চাইলেও দু-একটির বেশী নয়। এইরূপ সাংসারিক বিজ্ঞতাই এ পর্য্যন্ত সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করছিল। কিন্তু সম্প্রতি আর একটি কারণ উপস্থিত হয়েছে। মাতৃত্বই নারীজীবনের পরম ও চরম উদ্দেশ্য বলে' এখন আর স্বীকৃত হয় না। এখন নরনারী উভয়েরই মতে, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, সমাজ ও দেশনির্ব্বিশেষে মানবজাতির প্রতি, উভয়েরই সমান কর্ত্তব্য; সমাজসেবা, সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিধান, রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন-আলোচনা, সাহিত্য-বিজ্ঞানের চর্চ্চা, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই নরনারী উভয়েরই সমান অধিকার। এই জ্ঞান নারীর মনে এতদিন সুপ্ত ছিল, এখন জাগ্রত হয়েছে। নারী আর এখন পত্নীত্ব এবং মাতৃত্ব মাত্র

অবলম্বন করে' ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকাকে নারীজীবনের সার্থকতা লাভ করা মনে করে না। নারীর স্বাধীনতা নেই, স্বতন্ত্রতা নেই, ধর্ম্মশাস্ত্রের এ আদেশ নারী আর এখন মানতে চায় না। এখন নারী নরের সহযোগিনী, সহকর্ম্মিণী, সহধর্ম্মিণী, বা ততোধিক, স্বতন্ত্র হয়ে মানুষের সকল কাজই করতে চায় এবং মানুষের লভ্য সকল সুখ ও সকল আনন্দ লাভ করে' মানবজন্ম সার্থক ও সফল করতে চায়। এইরূপ মনোভাবসম্পন্না যাঁরা, তাঁরা এখন পত্নীত্বের এবং মাতৃত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে চাচ্ছেন। এঁদের সংখ্যাও ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীর সন্তানসংখ্যার হ্রাসের এও একটা প্রধান কারণ। বারট্রাণ্ড রাসেল আশঙ্কা করেন, যদি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয়, তা হ'লে, যে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর লোকের সন্তানসংখ্যার এখন হ্রাস হচ্ছে, তারা ক্রমে নির্ব্বংশ হবে এবং নিম্নতন শ্রেণীর লোকের সন্তানদ্বারা জাতির লোকসংখ্যার পূরণ হবে। তাতে জাতীয় চরিত্রের হীনতা জন্মাবে। কেবল যে ইংলণ্ডেই এইরূপ হবে, তা' নয়, সমস্ত সভ্যদেশেই হবে। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেন,—

"It seems unquestionable that if our economic system and our moral standards remain unchanged, there will be, in the next two or three generations, a rapid change for the worse in the character of the population in all civilized countries and an actual diminution of numbers in the most civilized." *

এই সম্বন্ধে কথা বলে' তিনি আরও বলেন যে, জনসংখ্যার

* Principles of Social Reconstruction.

আধিক্য মাত্রেই বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই, বরং ইউরোপের জনসংখ্যা যদি বৃদ্ধিশীল না হয়ে স্থিতিশীল হত, তা হ'লে ইউরোপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সহজ হত এবং যুদ্ধসম্ভাবনা অল্প হত। জন্মের হার কমে' গিয়েছে, তাতে দুঃখ নেই; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, লোকের মধ্যে যারা সব চেয়ে ভাল, জন্মের হার তাদের মধ্যেই সবচেয়ে কম।

কিন্তু ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙলায়, অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত, এখানে জন্মের হ্রাস হচ্ছে কৃষক এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানসংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। সেন্সাস-রিপোর্টে দেখা যায় ১৯১১ থেকে ১৯২১, এই দশ বছরে বাঙলার জমিদারদের মধ্যে বৃদ্ধির হার শতকরা ন' জন, আর কৃষকদের মধ্যে শতকরা তিন জন মাত্র। এই জমিদার শ্রেণীর মধ্যে জমির মধ্যবর্ত্তী উপস্বত্বভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অধিক। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হেতু এদের জমির আয় কমে' গিয়েছে; এঁরা এখন চাকরির বাজারে জনতা বৃদ্ধি করছেন এবং বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছেন।

উদাহরণস্বরূপ কায়স্থদের হ্রাস-বৃদ্ধির বিবরণ দেখা যাক। কায়স্থরা প্রধানতঃ চাকরিজীবী। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দশ বছরে এদের সংখ্যা কমে' গিয়েছিল শতকরা ৪; ১৯০১ থেকে ১৯১১ এই দশ বছরে বেড়েছিল শতকরা ১·৪; ১৯১১ থেকে ১৯২১ পর্য্যন্ত দশ বছরে বেড়েছে শতকরা ৮·৩। নিম্নতন জাতির প্রায় সকলেই শ্রমজীবী; তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান জাতির বৃদ্ধি নেই; কেবল হ্রাস, নিম্নলিখিত রূপ—

বাগদি	কমেছে	শতকরা	৯'২
ছুতোর	„	„	৮'১
মুচী	„	„	২'১
ধোবা	„	„	'৪
গোয়ালা	„	„	৬'৫
নাপিত	„	„	২'১
তাঁতি	„	„	৩'৬
কুমোর	„	„	২'০
কামার	„	„	'৯
মাল	„	„	৩'৯
মালী	„	„	৩'৩
রাজবংশী	„	„	৫'৬
সেকরা	„	„	৩'৬
তেলী	-	„	'৪

জাত হিসাবে ত এই হ্রাস ; ব্যবসায় হিসাবে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের তুলনায় কয়লা, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি খনিজের ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বেড়েছে ; বয়নশিল্প, মাটির বাসন, কাঠের এবং ধাতুর কাজে যারা নিযুক্ত তাদের সংখ্যা কমে' গিয়েছে ; রেল দিয়ে মাল চালানের কাজ যেমন বেড়েছে, গোরুরগাড়ী-চালকের সংখ্যা তেমনি কমেছে ; সরকারী চাকরিতে নিযুক্তের সংখ্যা যেমন ছিল তেমনি আছে ; আইন-ব্যবসায়ী ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেড়েছে ; শিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু সাহিত্য-ব্যবসায়ী কমেছে ; সৈন্য সংখ্যা বেড়েছে (কিন্তু তাতে বাঙালী নেই) ; ধর্ম্মযাজকের সংখ্যা কমেছে, ভূম্যধিকারীর কথা আগেই বলেছি—তাঁদের বৃদ্ধি শতকরা ৯ জন, আর কৃষকের বৃদ্ধি শতকরা ৩ জন।

আমেরিকা ও ইউরোপের নারীরা পুরুষদের সমকক্ষতা করতে আরম্ভ করে' সেখানকার পুরুষদের কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণ করে' দিচ্ছে; যে সকল কাজ আগে পুরুষদেরই একচেটে ছিল, তাতে নারীরাও এখন হস্তক্ষেপ করছে। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে পুরুষেরা যুদ্ধে গিয়েছে, আর নারীরা দেশের সকল কাজেই নিযুক্ত হয়েছে। প্রাথমিক পাঠশালার শিক্ষয়িত্রী, টাইপিষ্ট, ষ্টেনোগ্রাফার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি কাজে ত অধিকাংশই নারী। এর একটা ফল হয়েছে এই যে, অনেক নারী এখন পত্নীত্বের অধীনতা স্বীকার না করে' জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে; আর স্বীকার করলেও সংসারযাত্রায় কেবলমাত্র ভার্য্যা না হয়ে পতির সহকারিণী হতে পারে।

এদেশেও নারীর স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা ছিল; বাৎস্যায়ন মুনি উপদেশ দিয়েছিলেন—

তথা পতিবিয়োগেচ ব্যসনং দারুণং গতা।
দেশান্তরেঽপি বিদ্যাভিঃ যা সুখেনৈব জীবতি॥

কিন্তু আমরা মনুর প্রেতশাসন অতিক্রম করতে পারিনি। মনু আদেশ করেছেন—

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

আমরা সেই প্রেতশাসন মেনেই চলছি। জগতের সর্ব্বত্র কাল চলছে, অগ্রসর হচ্ছে—আমাদের দেশে কাল অচল, যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে; আমরা 'সে-কালেই' আছি এবং থাকব। এদেশের পুরুষ, নারীর স্বতন্ত্রতা লোপ করে', তাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করে; কাজেই ক্ষতিপূরণের প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে তার ভর্ত্তা হতে হয় এবং তার সন্তানের পালনকর্ত্তা পিতা হতে হয়।

তা' ছাড়া আমাদের নারীরা পুরুষদের কর্ম্মক্ষেত্র যাতে আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য নারীদের শিক্ষাবিষয়ে পুরুষেরা খুব সাবধান আছেন। নারীশিক্ষা এখনও বিলাসিতার মধ্যে আছে, অপরিহার্য্য আবশ্যকের মধ্যে নেই। বিদ্যা বিনয় (training) দেয়, বিনয় থেকে পাত্রতা (কর্ম্মযোগ্যতা) লাভ হয়, তা' থেকে ধন, ধন থেকে ধর্ম্ম এবং সুখ—এ সকল বচনের প্রয়োগ এখনও কেবল পুরুষদের জন্য, জ্ঞানবৃক্ষের ফল নারীদের জন্য এখনও প্রায় নিষিদ্ধ। একবার এক মুসলমান ভদ্রলোককে বলতে শুনেছিলাম যে তাঁদের মেয়েরা লেখাপড়ার মধ্যে 'পড়া' শিখতে পারে; তাতে তাঁদের আপত্তি নেই কারণ, তাতে মেয়েরা ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ে' পতিভক্তিমাহাত্ম্য শিখবে; কিন্তু 'লেখা' শেখাতে তাঁদের আপত্তি আছে কারণ, লিখতে শিখলে কত অবাঞ্ছনীয় লোকের সঙ্গে অবাঞ্ছনীয় বিষয়ে পত্রব্যবহার চলতে পারে! এ সকল অদ্ভুতনীয় যুক্তি প্রকাশ করতে এখন আমরা অবশ্য লজ্জিত হই। কিন্তু দশ-এগার বছরের বেশী বয়সের বালিকাকে স্কুলে

পাঠাতে হলে যেন একটা অপরাধের কাজ করছি বলে' মনটা এখনও সঙ্কুচিত হয়। আর, বালক-বালিকার সমান উচ্চ শিক্ষার কথা উঠলে আমরা এখনও অম্লান মুখে বলে' থাকি বালিকাটি কি চাকরি করবে? কোনো কোনো উচ্চশিক্ষিত পরিবারের দু-চারটি বালিকা উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন বা পাচ্ছেন, কিন্তু দেশের লোক-সমুদ্রে তাঁরা শিশিরবিন্দুবৎ। ভারতের ১৫,৩৫,৯০,০০০ (পনর কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার) নারীর মধ্যে লেখাপড়া-জানা নারীর সংখ্যা ২৭,৮২,০০০ (সাতাশ লক্ষ বিরাশী হাজার) মাত্র, শতকরা দু' জনও নয়, অর্থাৎ এক শ' জনের মধ্যে প্রায় আটানব্বই জন নিরেট নিরক্ষর! আর, এঁদের মধ্যে ইংরেজী জানেন ২,৩৮,১৬২ জন বা হাজারে দেড় জন আন্দাজ! আর, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে এই দু-চারটি বালিকার নাম দেখে আমরা আহ্লাদে আটখানা হই! বেকার সমস্যার সমাধানে দেশের লোকের সংখ্যায় যাঁরা অর্দ্ধেক, সেই নারীদের কথা ভুললে চলবে না।

বেকার সমস্যার সঙ্গে লোকবৃদ্ধির সম্বন্ধ সমাজ-সমষ্টির দিক থেকে এক রকম দেখা গেল। এখন একবার সমাজ-ব্যষ্টির দিক থেকে দেখা যাক। ব্যষ্টির হিসাব কোথাও সঙ্কলিত হয়েছে বলে' জানা নেই। কাজেই একটা উদাহরণ নিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

একটি কৃতবিদ্য সুচতুর যুবক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে একটি রূপগুণ-বৈশিষ্ট্য-বিহীন ধনরত্নসমন্বিতা অরক্ষণীয়া কন্যার পিতাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে', তাঁরই মূলধনের সাহায্যে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু মক্কেলেরা দলবদ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে অসহযোগ করায়, তিনি শিষ্টাচারের অনুরোধে আদালতবর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা না করলেও, কার্য্যতঃ বড় একটা আদালতে যাতায়াত করতেন না। তাতে অর্থ পেতেন না, কিন্তু আবশ্যকের অতিরিক্ত সময় পেতেন এবং দাম্পত্য প্রণয়তত্ত্বের গবেষণায় সেই অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন। বছর দশেক এইভাবে যাবার পর তিনি দেখলেন তাঁর অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই —আয় অল্প, ঋণ বিস্তর; একটি প্রসবের পূর্ব্বে এবং একটি প্রসবের পরেই মারা যাওয়া বাদে অযত্নপালিত রুগ্ন সন্তান পাঁচটি; নিজের স্বাস্থ্য ভগ্ন; গৃহিণী রুগ্না; গৃহ শ্রীহীন।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ঘরের এই চিত্র। এতে অতিরঞ্জন নেই। এইরূপ সংসারযাত্রার আর্থিক অংশটা বাড়ীর কর্ত্তাকে ভাবনায়-চিন্তায় অকালবৃদ্ধ করে' তার জীবনের স্ফূর্ত্তি ও সুখকে বিদায় করে' দেয়। আর গৃহিণী যিনি শ্রীরূপিনী হয়ে গৃহ আনন্দময় করবেন বলে' গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে এসেছিলেন, তিনি এখন শ্রীহীনা, সন্তানপালনবিব্রতা; সুতরাং শান্তি এবং আনন্দ তাঁর অনাদরে গৃহত্যাগ করে' গিয়েছে। রোগের জ্বালায়, ছেলেদের উপদ্রবে, সংসারের অনটনে, অবিশ্রান্ত গৃহকর্ম্মের ক্লান্তিতে এবং তার উপর পতিদেবতার কৃপায় তাঁর শরীর ও মন অবসন্ন, জীবন দুর্ব্বিষহ। নারীজীবনের কি শোচনীয় পরিণাম। এই জীবনটাকে সার্থক করবার জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক সমাজ নারীকে সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে' রেখেছে। এখনও পুরাণের পুরোণো নজীর দেখিয়ে তাকে পতিভক্তি এবং পতিসেবার শিক্ষাই দেওয়া হয়। কিন্তু সে আদর্শের পরিবর্ত্তন করে' একটা স্বাধীনতামূলক নতুন আদর্শের প্রবর্ত্তন নিতান্তই আবশ্যক হয়েছে। স্বাধীনতাই প্রকৃতির নিয়ম, পরাধীনতা তার ব্যভিচার। যেখানে আত্মার স্বাধীনতা নেই, চিন্তার স্বাধীনতা নেই, কার্য্যের স্বাধীনতা নেই, সেখানে প্রকৃত ভক্তি বা ভালবাসা থাকতে পারে না। সমানে সমানে স্বাধীনতার সহিত, জ্ঞানের সহিত যার সঙ্গে মনোভাবের বিনিময় হতে পারে, তাকেই "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ" বলে' ভালবাসা যেতে পারে। আমাদের সমাজে পূর্ব্বানুরাগ নেই, কন্যার স্বেচ্ছা নেই, স্বতন্ত্রতা নেই। আছে কন্যার দান, অলঙ্কার-তৈজসপত্রাদির সহিত, ইচ্ছা-অনিচ্ছা-বিরহিত নির্জ্জীব বস্তুর মত, দান আর গ্রহণ। তাতে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়

সেটা স্বামী-সেবিকার সম্বন্ধ ; একটি স্বাধীন আত্মার সহিত আর একটি স্বাধীন আত্মার মিলন নয়। কিন্তু একেই আমরা আধ্যাত্মিক বিবাহ বলে' মনকে প্রবোধ দিই। এই সকল বিবেচনা করে' বাৎস্যায়ন মুনি গান্ধর্ব্ব বিবাহকেই শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলেছেন—

বূঢ়ানাং হি বিবাহানামনুরাগঃ ফলং যতঃ।
মধ্যমোঽপি হি সদ্‌যোগো গান্ধর্ব্ব স্তেন পূজিতঃ॥
সুখত্বাদবহুক্লেশাদপি চাবরণাদিহ।
অনুরাগাত্মকত্বাচ্চ গান্ধর্ব্বঃ প্রবরো মতঃ॥

আর গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা নরনারীর মধ্যেই হওয়া সম্ভব বলে' বিবাহের পূর্ব্বে নারীর এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন যে, নারী পতির অনধীন হয়ে, পতিসাহায্য নিরপেক্ষ হয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহও করতে পারে। কারণ, অন্নদাসত্বের মত দাসত্ব আর নেই। কিন্তু আমরা বাৎস্যায়নের এ উপদেশ না গ্রহণ করে' মনুর আদেশই শিরোধার্য্য করেছি। এমন এক দিন ছিল, যখন স্বাধীন যুক্তির মনন থেকে ত্রাণ করবার জন্য শাস্ত্রের মন্ত্রের আবশ্যক হয়েছিল। কিন্তু এখন সে দিন গিয়েছে, অন্ততঃ যাওয়া উচিত হয়েছে।

সন্তানপালনের গর্ব্ব মাতৃত্বের বড় গর্ব্ব। আমরা মনে করি সকল মাতাই সন্তানপালনে অভিজ্ঞ এবং পটু। এবং শিশুদের শিক্ষাও তাঁদেরই দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে মাতাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, সামর্থ্য আমরা কিছুই বিচার করি না। পাশ্চাত্য দেশে এ বিষয়ে সকল পিতামাতার সামর্থ্য সমান নয় বলে', রাষ্ট্রশক্তি শিশু-শিক্ষার ভার নিয়েছে। আমাদের ভদ্রলোকের মধ্যে একটা বাজার-চলতি শিক্ষা আছে। সেই শিক্ষা পেয়ে পূর্ব্ববর্ণিত দরিদ্র ভদ্র ঘরের অযত্ন-

পালিত ছেলেগুলি যথাকালে কর্ম্মক্ষেত্রে উমেদাররূপে উপস্থিত হয় এবং কিছুকাল বেকারদলে থেকে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে। তারপর পিতার, মাতুলের বা অন্য কোনো আত্মীয়ের সাহায্যে এবং বহুচেষ্টায় কেউ কেউ চাকরি পায়। অনেকেই পায় না। কেউ তার পূর্ব্বে কেউবা পরে বিবাহ করে এবং বংশবৃদ্ধি করে। এইরূপ আমাদের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সংসারচক্র অবিরাম ঘুরছে, "যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ" সে-পথের রেখামাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

এইরূপে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক চাকরিতে নিযুক্ত হচ্ছে, যারা উদ্বৃত্ত হচ্ছে তারা বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। চাকরিতে নিযুক্তের সংখ্যার বড় একটা বৃদ্ধি নেই, কাজেই বৃদ্ধিটা হচ্ছে বেকারের দলে। অপর দিকে, আগেই দেখিয়েছি, আমাদের কৃষক ও শ্রমশিল্পী শ্রেণীর লোকসংখ্যা কমে' যাচ্ছে। তাই যেন প্রকৃতির শূন্যতা পরিহার করবার নিয়মে 'ভদ্র সন্তানেরা' এখন কৃষক ও শ্রমশিল্পীর ব্যবসায় অবলম্বন করছে। কাপড়ের দোকান, মুদীর দোকান, মণিহারীর দোকান, চামড়ার দোকান, জুতার দোকান ব্রাহ্মণাদি সকল জাতের লোকেই করছে। স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার—সকলের বৃত্তিই এখন জাতি নির্ব্বিশেষে ভদ্র সন্তানেরা আরম্ভ করেছে। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চবর্ণের ছেলেরা কল-কারখানায় মিস্ত্রিগিরির শিক্ষানবিশীর জন্য লালায়িত; সকলের ভাগ্যে তা'ও ঘটে' উঠছে না। তার প্রধান কারণ, আগেই বলেছি, যোগ্যতার অভাব, শিক্ষার অভাব। আর একটা কারণ, সেটাও অপ্রধান নয়, বাঙলা

দেশে এই সকল কাজে বহুল পরিমাণে বিদেশী লোক নিযুক্ত হয়েছে; উচ্চ কর্ম্মে ইউরোপীয়েরা ত আছেই; তার নীচে, ব্যবসায়ে এবং শ্রমশিল্পের কাজে, মাড়বারী, গুজরাটি, পারসী, পঞ্জাবী, ওড়িয়া প্রভৃতি বাঙলার বাইরের সকল প্রদেশের লোকই বাঙলায় এসে বাঙালীর প্রাপ্য কাজে ভাগ বসাচ্ছে। দেশ-দেশান্তরে বড় বড় ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা বলছি না; তার আন্তর্জ্জাতিকতা এখন আর অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাতেও পারম্পর্য্য নেই। ছোট ছোট দোকান-পসার, ছোট ছোট শিল্পপণ্য প্রস্তুত করা, কল-কারখানার ছোট ছোট কাজ, রেল, মোটরকার, ট্রামকার, ঘোড়ারগাড়ী, গোরুরগাড়ী চালান, ফেরীওয়ালার কাজ, এমনকি ক্ষেতের ফসলকাটা—সকল কাজেই বাঙলার বাইরের লোক। অন্য দেশ বিদেশ থেকে বাঙলায় লোক এসেছে, কিন্তু বাঙলার লোক বাঙলার বাইরে গিয়েছে অতি অল্পই।

অবস্থা ত এই। এখন আমাদের কি করা উচিত? মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের কর্ম্মাভাবজনিত ক্লেশ অত্যন্ত অধিক হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদেরই কর্ম্মাভাবটা দূর করা উচিত সকলের আগে, এ কথাটা ঠিক নয়। যাঁরা এইরূপ বলেন তাঁদের অধিকাংশই সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোক এবং নগরবাসী। নিম্নশ্রেণীর পল্লীগ্রামবাসীদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি পড়েনি; তাদের অস্তিত্বই তাঁরা জানেন না! তাঁরা সংবাদপত্রে এবং সাময়িক সাহিত্যে তাদের দারিদ্র্যের কথা পড়েন কিন্তু তাতে তাঁদের হৃদয়ে তার বাস্তব অনুভূতি হয় না, বেদনা হয় না। এই পল্লীবাসী দরিদ্রের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী। এদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে নগরবাসী উচ্চশ্রেণীর লোকের একটা স্পষ্ট ধারণা নেই, কারণ, কৃষক ও শ্রমজীবী বাক্‌শক্তিহীন, তাদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে সংবাদপত্রে বা বক্তৃতামঞ্চে তারা আন্দোলন করে না। অপর পক্ষে, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা শিক্ষিত, অনেক সময়ে উচ্চশ্রেণীর লোকদের আত্মীয়; কাজেই তাদের অভাব-অভিযোগের যথেষ্ট আন্দোলন-আলোচনা হয়। সে আন্দোলন দেশের শাসকবর্গের কানেও পৌঁছোয়। শাসকবর্গও কখনো কখনো মুখে বলেন এদের কর্ম্ম-

হীনতা দূর করবার জন্য কিছু করবেন এবং তার একটা সহজ উপায় উদ্ভাবন করবার জন্য কমিশন এবং কমিটিও নিযুক্ত করেন, কিন্তু কাজে কিছু হয়ে উঠে না, অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু হয়নি ; হওয়া সম্ভবও নয়। সমুদ্রজলের সাধারণ সমতল থেকে একটা অংশকে অবশিষ্ট অংশের চেয়ে উঁচু করে' রাখা যেমন অসম্ভব, জনসমাজের সাধারণ হীন অবস্থার সমতল থেকেও তেমনি মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোককে স্বতন্ত্র করে' উঁচু করে' রাখা অসম্ভব। সেইজন্য চেষ্টা করতে হবে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেরই অবস্থার উন্নতি করতে। দারিদ্র্য সমাজ-শরীরের মহাব্যাধি ; সমাজের অধিকাংশ এই ব্যাধিগ্রস্ত থাকতে অল্পাংশ নিরাপদ হতে পারে না।

বেকার সমস্যার সমাধানে শিক্ষার স্থান সর্ব্বপ্রথমে। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী কেবল আমাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করছে, কর্ম্মের যোগ্যতা সম্পাদন করছে না। রাষ্ট্রীয় আবশ্যকের মধ্যে এমন কোনো কর্ম্ম থাকবে না, যার যোগ্যতালাভ আমাদের রাষ্ট্রীয় শিক্ষা দ্বারা হয় না। অন্য কোনো দেশে স্বদেশের কাজের জন্য বিদেশ থেকে লোকও আনতে হয় না, বিদেশে গিয়ে যোগ্যতালাভ করেও আসতে হয় না। আর, অন্য কোনো দেশে বিজাতীয় ভাষায় দেশের কাজকর্ম্মও চলে না। বলা বাহুল্য, এই প্রভেদের হেতু আমাদের পরাধীনতা। সুতরাং আমাদের কর্ম্ম আমাদের কর্ত্তাদের ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়, আমাদের ইচ্ছায় নয়। কিন্তু 'তা' বলে' আদর্শটাকে খর্ব্ব করলে চলবে না। সকল রকমের শিক্ষা যাতে দেশের মধ্যে দেশীয় ভাষায় হয় তার চেষ্টা

করতে হবে। আর চেষ্টা করতে হবে সেই শিক্ষা যাতে বাধ্যতামূলক হয় এবং সার্ব্বজনিক হয়। তা হ'লে তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ফল হবে এই যে আজকাল যত বেকার বসে' আছে, তার চতুর্গুণ লোক এই শিক্ষার কাজে নিযুক্ত হতে পারবে। বাঙলাদেশে যদি বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, আর প্রতি একশ' জনের জন্য একটি শিক্ষকও নিযুক্ত হয়, তা হ'লে বাঙলার সাড়ে চার কোটি লোকের জন্য সাড়ে চার লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। বর্ত্তমান বেকার এবং ভবিষ্যত বেকারদের সম্মুখে একটা বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হবে এবং তাতে নরনারী উভয়েই বহুসংখ্যায় নিযুক্ত হতে পারবে।

তারপর, বর্ত্তমান কৃষিকর্ম্মে এবং শ্রমশিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত লোকের অতিরিক্ত যত লোক কর্ম্মহীন হয়ে বসে' আছে, তাদের জন্য দেশের মধ্যে যেখানে বিস্তীর্ণ পতিত জমি আছে, সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে। দেশের ভিতর এইরূপ উপনিবেশ স্থাপন করে' অতিরিক্ত লোকের বাসস্থান ও কর্ম্মসংস্থান করা—Home Colonization—সকল দেশেই ছিল। দেশের বাইরে লোকবিরল নবাবিষ্কৃত নতুন নতুন দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করা এই নীতিরই সম্প্রসারণ মাত্র। কিন্তু এতে রাজসাহায্যের আবশ্যক। রাজসাহায্যে অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, কেন্যা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি অনেক স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু আমাদের সে সকল স্থানে উপনিবেশী হয়ে যাবার অধিকার নেই। অধিকার আছে ইউরোপীয় উপনিবেশীদের আমাদেরকে কুলী করে' তাদের দাসত্ব করতে সেখানে নিয়ে যাবার। সুতরাং

আপাততঃ দেশের বাইরে উপনিবেশ স্থাপন করার কথা ছেড়ে দিয়ে, দেশের ভিতরে যে সকল অনাবাদী জমি পতিত আছে, সেইখানে উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে, আর তাতে আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের অগ্রণী হতে হবে। এই সকল উপনিবেশে প্রধান কর্ম্ম হবে কৃষি। কিন্তু ঔপনিবেশিক কৃষিকর্ম্মে ইংরেজী প্রথা চলবে না। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙলা-দেশে ইংরেজী কৃষিকর্ম্মের যে অভিজ্ঞতা আছে সেটা অত্যন্ত শোচনীয়। তার প্রধান উদাহরণ নীল এবং চা'র চাষ। ইংরেজ আমাদের রাজার জাত, তাঁরা স্বহস্তে চাষ করতে পারেন না। তাঁদের চাষের জন্য দাসকল্প 'কুলী' চাই। সেই 'কুলী' কেমন করে' সংগ্রহ করা হয়, তারপর তাদেকে চা-বাগানে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রতি কেমন ব্যবহার করা হয়, তা' আর কারো অবিদিত নেই। নীলকরের কীর্ত্তি ত বাঙালীর সুপরিজ্ঞাত। অন্য দেশেও ইংরেজদের কৃষিকর্ম্মরীতি সেইরূপই। আমেরিকার আবিষ্কারের পর ইংরেজ যখন আমেরিকায় যান তখন কৃষিই ছিল তাঁদের প্রধান কর্ম্ম; কিন্তু সে কৃষি করতে ইংরেজ আফ্রিকা থেকে কাফ্রি ধরে' আনতেন এবং তাদের প্রতি যে অকথ্য অমানুষিক ব্যবহার করতেন তা' এখন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ আমেরিকায় ও মালয়-ষ্টেটে রবার-চাষেও সেই রীতিই ইংরেজ অবলম্বন করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশী কৃষকের উপকারার্থে আইন হয়েছে যে, সেদেশের আদিম অধিবাসীদের ঘাসের কুটীরের জন্য টেক্স দিতে হবে এবং তা'রা আখ, গম, তুলো প্রভৃতি লাভজনক ফসলের চাষ করতে পাবে না। কাজেই টেক্স দেবার জন্য বাধ্য হয়ে উপনিবেশী

শ্বেতকায় কৃষকের কৃষিক্ষেত্রে কাজ করবে। বাঙালী উপনিবেশ স্থাপন করে' কৃষিকর্ম্ম করলে এ রীতিতে কাজ করতে পারবে না; পারা যে উচিত নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। শিক্ষিত বাঙালী যুবককে স্বহস্তে সকল কাজ করতে হবে। মজুরি দিয়ে লোক নিযুক্ত করলে, নীলের চাষে যা' হয়েছে, চা-বাগানে যা' আজও হচ্ছে, তাই হবে। তা' ছাড়া, তাতে জমিশূন্য এক শ্রেণীর দৈনিক মজুরের সৃষ্টি হবে। আর তারা জমির অভাবে, শিক্ষার অভাবে, সাময়িক কর্ম্মের অভাবে চিরদারিদ্র্যে নিমগ্ন থেকে বংশানুক্রমিক 'কুলী'ই থাকবে। সেরূপ যাতে না হয়, প্রথম থেকেই তার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে কাজ না করে' যৌথভাবে করলে এ বিষয়ে অনেক সুবিধা হবে। আর, এখন যে সকল কাজ হাতে হয় তা' তখন কলে হবে। এমন সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বেরিয়েছে যে, লাঙ্গল-চষা, জল-ছেঁচা, ফসলকাটা প্রভৃতি কাজ আর হাত দিয়ে করতে হয় না। সেই সকল পরিশ্রম-বাঁচান-যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। আর, শারীরিক পরিশ্রমের গৌরব—dignity of manual labor—যা' এখন কেবল পাঠ্য পুস্তকে পড়া হয়, তা' কাজে করে' শিখতে হবে। স্কুল-কলেজের ছুটির সময়ে ছাত্রেরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে বাস করবে এবং শিক্ষানবীশ হয়ে তাদের সকল কাজে সাহায্য করবে। এতে হাতে-হাতিয়ারে কাজের শিক্ষালাভ ত হবেই, ততোধিক লাভ হবে আভিজাত্যের বৃথা অভিমান-ত্যাগের শিক্ষা। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হলে আমরা কৃষক ও শ্রম-জীবীদের সঙ্গে মিলে তাদের সহযোগিতায় দেশের সকল কাজে অগ্রসর হতে পারব। এখন কৃষক ও শ্রমজীবী সমাজের উচ্চস্তরস্থ

নেতাকে অকপট হৃদয়ে আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস করতে পারে না, তখন তারা আমাদের সমান হবে, আত্মীয় হবে, আমাদের কথা বুঝবে, তাদের নিজেদের অবস্থা বুঝবে এবং বুঝে-সুঝে রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক সকল কাজে আমাদের সহকারী হবে।

আজকাল অন্য কর্ম্মের অভাবে অনেক ভদ্রলোক কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করছেন। এটা খুব শুভ লক্ষণ বলতে হবে। তাতে নিষ্কর্ম্মা ভদ্রলোকের কর্ম্ম হচ্ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে বর্ত্তমান কৃষকের কর্ম্ম-হীনতা বাড়ছে, তার জমিও যাচ্ছে, কর্ম্মও যাচ্ছে। কিন্তু চাই আমাদের নতুন জমিতে নতুন আবাদ করে' নতুন কর্ম্মের সৃষ্টি করা। উপনিবেশ স্থাপন করাই এর একমাত্র উপায়। এই কাজে আমাদের জমিদারেরা আমাদের বিশেষ সহায়তা করতে পারেন।

এই সকল উপনিবেশে কৃষি ছাড়া শিল্পও থাকবে। সাধারণ কৃষিজাত দ্রব্যাদি থেকে যে সকল নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পপণ্য প্রস্তুত হতে পারে, তা'ও হবে।

কৃষিশিল্প ছাড়া দেশের অন্যান্য সকল কাজেই যাতে দেশের লোক নিযুক্ত হতে পারে তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। সে কথা বিশেষ করে' আগেই বলেছি। এখন যে কাজে আমাদের যোগ্যতা নেই বলে' আমাদের দেওয়া হচ্ছে না, সে কাজেও যাতে আমাদের যোগ্যতা হয় সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যোগ্যতার অভাব আবার দু'রকম—এক প্রকৃত অভাব, আর এক যোগ্যতা আছে কিন্তু নিয়োগকর্ত্তা মনে করেন অথবা মনে না করলেও প্রকাশ করেন যে, যোগ্যতা নেই। তার হেতু অনেক সময়ে বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, জাতীয় গৌরবহানির আশঙ্কা, 'আত্মীয় প্রতিপালনের

ইচ্ছা বা অন্যবিধ স্বার্থ। আমাদের পরাধীনতা কতকগুলি কাজের অন্তরায় হয়ে আছে, যেমন সৈনিকবিভাগ, নৌবিভাগ, বিমান-বিভাগ এবং পররাষ্ট্রবিভাগের ছোটবড় সব কাজ। সে অন্তরায়ও যাতে না থাকে তা'ও অবশ্য করতে হবে। সেটা রাষ্ট্রনৈতিক উপায়সাধ্য। তা' বলে' অবশ্য তা' থেকে বিরত হওয়া যেতে পারে না। এক সৈনিকবিভাগের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হলেই কত বেকার তাতে প্রবেশ লাভ করে' কর্ম্ম পেতে পারে! বিদেশী সৈনিক কর্ম্মচারী পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। এখন আমাদের করতে হবে সৈনিক, অসৈনিক, সরকারী, বেসরকারী, দেশের সকল কর্ম্ম যাতে আমাদের প্রাপ্য হয় তার ব্যবস্থা, তার উপযুক্ত শিক্ষা, কর্ম্মের সংখ্যা অনুসারে শিক্ষিত কর্ম্মীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করা এবং তারও আগে রাষ্ট্রের, সমাজের এবং ব্যক্তির সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করা। তা হ'লেই দেশে আর কর্ম্মহীনতা থাকবে না; দেশের আর্থিক উন্নতি হবে।

দেশের আর্থিক উন্নতির 'নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'। কর্ম্মই আর্থিক উন্নতির মূল, আর আর্থিক উন্নতিরই নামান্তর সভ্যতা। সভ্যতা মানেই জীবনযাত্রার মান—Standard of living—বাড়ান। শরীর এবং মনের সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য, তেজ, উৎসাহ ব্যয় করে' কেবল প্রাণধারণ করলে মানুষ সভ্য হয় না, মনুষ্যত্ব লাভ করতে পরে না। মনুষ্যত্ব লাভের জন্য চাই পরিমিত পরিশ্রম, যথেষ্ট বিশ্রাম এবং এই উভয়ের সমবায়ে জীবনের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ। এই সকলের জন্য অর্থের অাবশ্যক। সেইজন্য আদিম সভ্যতার যুগে অর্থকে চতুর্ব্বর্গের মধ্যে ধর্ম্মের নীচেই

স্থান দেওয়া হয়েছিল, এখন তার উপরেই স্থান দেওয়া হয়, এবং "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্" ইত্যাদি উপদেশের অবারিত প্রচার সত্ত্বেও সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে অর্থের সম্মান এবং প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে। অর্থের পুঞ্জীকরণ এবং বৈষম্যই যত অনিষ্টের মূল। সেই পুঞ্জীকরণ এবং বৈষম্য পরিহার করে' সকলের জন্য কর্ম্মসংস্থানের উপায় নির্দ্ধারণ করাই এখনকার সমাজতত্ত্ববিৎ অর্থশাস্ত্রীর প্রধান কার্য্য। কর্ম্মে আমাদের জন্মগত অধিকার আছে; যে সামাজিক ব্যবস্থায় সমাজের একটি লোকও সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা সামাজিক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। সমাজকে সুখশান্তিতে রক্ষা করে' শ্রীসম্পন্ন করতে হলে কর্ম্মের সুযোগ সকলকেই দিতে হবে।

শেষ